শব্দ ও উচ্চারণ

PHONETICS IN BENGALI

BY

ASUTOSH BHATTACHARYYA,

M. A (Sanskrit and Bengali) : University Prizeman : Sometime University Research Student : Late Honorary Secretary, Dacca University Journal : Of the East Indian State Railway Indian School.

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম. এ.
প্রণীত

গ্রন্থ-নিকেতন :
১৯২ ডি. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ক
১৩৪৩

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

১৯২ ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
'গ্রন্থ-নিকেতন'
হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে কর্তৃক
প্রকাশিত

এই গ্রন্থকার প্রণীত

শব্দ ও উচ্চারণ (ভাষাতত্ত্ব) ... ... ১৲
মধুমালা (কাব্যগ্রন্থ) ... ... ১৲

গ্রন্থ-নিকেতন
১৯২ ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মনের আগুন (ছোট গল্প) ... ... ১৲
আজব বেদে (সচিত্র শিশু কাব্য) ... ... ||০
অস্তায়মান (উপন্যাস) ... ... যন্ত্রস্থ

মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট
৪০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শক্তি প্রেস,
২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

এই পুস্তকে নিবদ্ধ বিষয়গুলি আংশিক ভাবে যখন "ভারতবর্ষ"-প্রমুখ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন তাহা হইতে পুনরায় একাধিক পত্রিকায় তাহা সংকলিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে এই প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এবং কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলাভাষা পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়ায় বাংলাভাষার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিষয়ে ইংরাজিতে লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে, কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বানু-মোদিত উপায়ে লিখিত বাংলাভাষায় অধিক পুস্তক নাই। অতএব বর্ত্তমানকালে এমন একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম বলিতে হইবে। এই বিষয়ে বর্ত্তমান পুস্তকখানি কতদূর সেই অভাব দূর করিতে পারিবে তাহা আমার সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আমার বাংলাভাষার ইতিহাস ও বাংলাভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম.এ. ডি. লিট্. (লণ্ডন) ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম.এ. ডি. লিট্ (প্যারিস্) মহোদয়দ্বয়ের বহু নিজস্ব মতবাদ হয়ত জ্ঞাতসারে

কিম্বা অজ্ঞাতসারে এই পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছি। সেইজন্য তাঁহাদের নিকট আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না। আমার এই পুস্তকে যদি কোন কৃতিত্বের ভাগ থাকে তবে তাহা তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষালব্ধ এবং নিন্দার ভাগ আমারই নিজস্ব বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান পুস্তকের শেষাংশ ("কথ্যভাষা") আমাকর্ত্তৃক লিখিত The Origin and Development of the Bengali Dialects নামক ইংরাজি পুস্তকের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি হইতে আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি ব্যক্তিগত কারণে দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান পুস্তকখানি সম্বন্ধে কেহ যদি কোন দোষ ত্রুটির নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তবে আমার ভবিষ্যতে উক্ত পুস্তক সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

এই পুস্তক রচনায় বহুভাবে অনেকের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বোল্লিখিত আমার পূজনীয় অধ্যাপক ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই দূরবর্ত্তী দেশেও আমাকে তাঁহার অমূল্য উপদেশাদি দ্বারা সর্ব্বদা উৎসাহিত করিয়াছেন। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুরাণরত্ন ও শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ আবস্থী এম. এ. (আগ্রা) মহোদয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমার এই পুস্তকের সহিত তাঁহাদের নাম সংশ্লিষ্ট রাখিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

আসানসোল, ই. আই. আর.
২০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন ভট্টাচার্য্য বি. এল

মহোদয়ের শ্রীচরণে

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

শব্দ ও উচ্চারণ

অনেকের বিশ্বাস, বাংলা ভাষায় বানান-সমস্যা বোধ হয় আধুনিক সৃষ্টি, প্রাচীনকালে এমন ছিলনা ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বর্ত্তমানের তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এই সমস্যা সকল প্রকারেই জটিলতর ছিল।

মাগধী অপভ্রংশ হইতে বঙ্গভাষার জন্ম। সেই জন্য প্রাচীনতম বঙ্গ-ভাষার সে নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার বানানেও অপভ্রংশ-সুলভ ব্যাপক ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপভ্রংশেরও একটা ব্যাকরণানুযায়ী নিয়ম আছে। প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গভাষা যদি ঐ নিয়মকেই অনুসরণ করিয়া চলিত তাহা হইলেও বাংলা বানান প্রথম হইতেই একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া লইত। বঙ্গভাষার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা তাহার জন্মকাল হইতেই সংস্কৃতের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতে দেখা যায়। সেই জন্য অপভ্রংশের রীতির সহিত মূল সংস্কৃতের রূপ মিশ্রিত হইয়া ইহার বানানকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমস্যা-মূলক করিয়া তুলিয়াছে। এইভাবে সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগেও বানানের চরম স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

অনেকের আবার বিশ্বাস যে, প্রাচীন বাংলা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত প্রভাব হইতে মুক্ত। কিন্তু ইহা কদাচ সত্য নহে। প্রাচীনতম বঙ্গ-ভাষার নিদর্শন স্বরূপ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে "বৌদ্ধগান" প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে. সর্ব্বসমেত ২১৩৫টি শব্দ

আছে। তন্মধ্যে ৩০০টিই সংস্কৃত শব্দ। এই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের বানান প্রায়ই প্রাকৃতানুযায়ী হইত; যেমন, 'কাআ', 'জথা', 'মণ'। কিন্তু সমস্ত বানানই যদি এই প্রকার প্রাকৃতের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিত তবে অবশ্য কোন সমস্যারই সৃষ্টি হইত না; পরন্তু বিশুদ্ধ সংস্কৃতানুযায়ী বানানেরও তাহাতে অপ্রাচুর্য্য নাই; যেমন, 'অঙ্গন', 'সুখ', 'রস'।

মধ্যযুগের বানান অনেকটা প্রাকৃত-প্রভাব-মুক্ত হইয়া আসিতে দেখা যায়। ইহার কারণ মধ্যযুগ হইতেই বঙ্গদেশে ব্যাপক সংস্কৃতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। সেই সময়কার অধিকাংশ আখ্যায়িকাও ছিল পৌরাণিক; তখনকার কোন পুঁথি ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত শব্দ ও বাংলা শব্দ প্রায় সমপরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই সময়ের লিপিকারেরাও ক্রমে অজ্ঞতা-মুক্ত হইয়া বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছেন।

এই ত গেল চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কথা। চৈতন্য-সাহিত্য বঙ্গ-ভাষায় যে কেবল জীবন-চরিত লেখার প্রবর্ত্তন করিল তাহাই নহে, ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ভিতর দিয়া বাংলা বানানেও সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, চৈতন্য-চরিতকারেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সেই জন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার ও তাহাদের বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইভাবে ভারতচন্দ্র রায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও তাহাদের বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা বঙ্গভাষায় বিশেষভাবেই বিস্তৃতি লাভ করিল।

ভারতচন্দ্র রায়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হওয়ায় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার বানানের বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে

রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কারণ এই যুগের লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি সকলেই সংস্কৃত-পন্থী ছিলেন। যেদিন হইতে বঙ্গভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র জন্ম হইল সেইদিন হইতে ভাষার দিক দিয়া যেমন এক সমস্যার উদ্ভব হইল, সেই রকম বানানের দিক দিয়াও এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইল। সংস্কৃত-পন্থীরা মনে করিয়াছিলেন যে, এই প্রকার ভাষার জন্ম সাহিত্যে ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না; বঙ্কিমচন্দ্র আংশিক এই ভাষাই গ্রহণ করিলেন, দীনবন্ধু মিত্রও তাঁহার নাটকের নিম্নতন চরিত্রগুলি এই ভাষা দিয়াই সৃষ্টি করিয়া রসজ্ঞের মনোরঞ্জন করিলেন। কথ্য এবং প্রাদেশিক ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করিলে ইহাদের বানানের ব্যভিচার অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং এইজন্যই সেই সময় হইতে বঙ্গভাষার ভাষা-সমস্যার মত বানানও অন্যতম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

চণ্ডীকাব্যকার মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব হইতেই বাংলা কবিতায় মুসলমানি শব্দ প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করে। ভারতচন্দ্র রায় ও তাহার পরবর্ত্তী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যাপকভাব মুসলমানি শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিদেশি শব্দগুলির বানানে চরম ব্যভিচার লক্ষিত হইত এবং এমন কি একই লেখককে একই শব্দের বিভিন্ন বানান ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। কেহ বা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি ইহাদের উপর আরোপ করিয়া ইহাদের বাংলা বানান গঠন করিয়াছিলেন, কেহ বা ইহাদিগকে বিদেশি শব্দ বিবেচনা করিয়া যথেচ্ছ বানান করিয়াছেন। এমন কি নিম্নলিখিত এই প্রকার কতকগুলি

শব্দের বানান এখন পর্য্যন্তও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; যেমন, 'জিনিস', 'জিনিষ', 'বাকি', 'বাকী'; 'খুসি', 'খুসী', 'খুশী', 'খুশি'; 'চসমা', 'চশমা'; 'দেরী', 'দেরি'; 'শহর', 'সহর'; 'শব্জী', 'সবজী'; 'সাদা', 'শাদা' ইত্যাদি। বাংলা বানানের একটা নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না থাকার জন্য এই সমস্ত বাংলায় ব্যবহৃত আরবি-পারসি শব্দের উপর বানানের স্বেচ্ছাচারিতা চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অল্পকাল মধ্যেই আবার বাংলা ভাষার সঙ্গে পোর্ত্তুগীজ, ইংরেজি ও ফরাসি শব্দের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে একমাত্র মুসলমানি শব্দ যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই জটিলতর হইয়া উঠিল মাত্র।

বাংলা ভাষার সহিত যে শুধু পাশ্চাত্য ও মুসলমানি শব্দেরই যথেচ্ছ সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা নহে; বাঙ্গালি জীবনের বিভিন্নমুখী বৈষয়িক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গেও ইহার শব্দ-সম্পদের আদান প্রদান হইতেছে। এই ভাবে বহু আসামি, ওড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি শব্দও বাংলা ভাষায় আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের বাংলা বানান গঠনেও কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করা হয় না।

আধুনিক বাংলা ভাষার বানানের একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃত-প্রভাব-মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছে। ইহা বাংলা বানানের পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ, সংস্কৃত ভাষায় যে সুসংবদ্ধ ব্যাকরণের নিয়ম এতকাল যাবৎ ঐ ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহার নির্দ্দেশাধীনে আসিলে বাংলা ভাষার ক্ষেত্র হইতেও বানানের স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইবে। অনেকে এই কথা তুলিয়া তর্ক করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃতের নিয়ম বাংলায় খাটিবে কেন? কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত

যে, বাংলা ভাষা গোড়া হইতেই সংস্কৃতের নিকট ঋণী, অতএব একটা নিয়ম যদি মানিতে হয় তবে সংস্কৃতেরই নিয়ম মানিয়া লওয়া উচিত; কারণ, উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা একটা ভাষার ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত হইতে পারে না। যেদিন বাংলার নিজস্ব নিয়ম গঠনের দিন আসিবে সেদিন সংস্কৃতকে বিদায় দিলেও চলিবে।

শব্দের ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের অভাব থাকিলেই সাধারণতঃ বানান বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। বাংলা ভাষার আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকেরই এই ত্রুটী বর্ত্তমান। অতএব সাহিত্যের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভাষাতত্ত্বের আলোচনাও বিস্তৃতি লাভ করে তাহার চেষ্টা করিলেই বঙ্গভাষা এই ব্যভিচার হইতে মুক্ত হইতে পারে।

বানান-সমস্যা সৃষ্টির আর একটি প্রধান কারণ এই যে বাংলার উচ্চারণ-রীতির সঙ্গে তাহার বর্ণমালার নিবিড় সম্পর্ক নাই। ভারতের কোন সুদূর অতীত যুগের কোন এক বিশেষ উচ্চারণানুযায়ী গঠিত বর্ণমালাকে আমাদের সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে; তদুপরি বর্ত্তমান বাংলারও বিভিন্ন স্থানের উচ্চারণ-রীতির কোন ঐক্য নাই। তাহা হইলেও সার্ব্বজনীন উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট রীতিকে অবলম্বন করিয়া আপনা হইতেই বানান কোন বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসিত।

প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণের একটা নিজস্ব রীতি আছে। প্রত্যেকেই তাহার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকে, ইহা একটি বংশানুক্রমিক গুণ। ক্রমে জাতীয় ভাষা এই উচ্চারণানুযায়ী গঠিত হয়। নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, বাঙ্গালি একটি সঙ্কর বা মিশ্র জাতি। বাঙ্গালির বাহ্য অবয়বে যেমন পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য অতি অল্প অন্তঃপ্রকৃতিতেও তেমনি। জাতিগতভাবে বাঙ্গালির নিজস্ব উচ্চারণের কোন রীতি নাই। একই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের

উচ্চারণ এত পৃথক যে পরস্পরের ভাষাই স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। এই কারণে রাঢ়, বরেন্দ্র, ও বঙ্গে বিভিন্ন প্রকৃতির কথ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ময়মনসিংহের সহিত তাহার সংলগ্ন জিলাগুলির উচ্চারণের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। শুধু তাহাই নহে, যে কলিকাতা সহরের উচ্চারণ আমরা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে যাই তাহারও বিভিন্ন পরিবারের উচ্চারণ-রীতি এক নহে। ইহার কারণ, কলিকাতা নূতন সহর; বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকই এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছে; তাহাদের কৌলিক উচ্চারণের রীতি কেহ এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভারতের অন্য কোন প্রদেশের ভাষায় বাংলার মত এত অল্প স্থানের ব্যবধানে এত পার্থক্য নাই।

ইহা হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে যে, বাংলায় উচ্চারণানুযায়ী নিজস্ব বানান গঠনের উপায় নাই। কারণ, বানানে একটা সার্ব্বজনীন রীতি গ্রহণ না করিলে ভাষার ঐক্য নষ্ট হয় এবং তাহা হইতেই জাতীয় ঐক্য শিথিল হইয়া পড়ে। উচ্চারণগত পার্থক্য থাকিলেও লেখ্য ভাষায় একটা বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিলে ভাষার সংহতি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দের মধ্যে এই ঐক্যসংস্থাপক নিয়মের নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ-জাত শব্দ, সংস্কৃত হইতে নিয়মিত ভাবে জাত শব্দ, দেশজ, মুসলমানি ও ইউরোপীয় প্রভৃতি ভাষার শব্দ। ইহাদিগকে যথাক্রমে 'তৎসম', 'অর্দ্ধতৎসম' 'তদ্ভব' 'দেশি' ও 'বিদেশি' শব্দ বলা হইয়া থাকে। উহাদের রীতি ও বানান-গঠন সম্বন্ধে এক্ষণে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

তৎসম শব্দ

বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দকে তৎসম শব্দ কহে। যেমন, 'বৃক্ষ', 'নির্ণয়', 'শিরস্ত্রাণ' ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা ভাষায় এই শব্দের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। সেইজন্য ইহাদের বানান সম্পর্কেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বিস্তৃতভাবে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইহা প্রত্যেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই জাতীয় শব্দের সংস্কৃত অভিধানের নির্দ্দেশানুযায়ীই বানান হইবে; সাধারণতঃ তাহাই হয়ও। বাংলাই ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সংস্কৃত-পন্থী। হিন্দিতে অনেক সংস্কৃত শব্দের বিকৃত বানান হয়; যেমন, 'সির্' (শিরঃ) 'মুসল' (মুষল) মক্‌খী ('মক্ষী); বাংলায় এমন হয় না। কিন্তু তথাপি বাংলার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য এই জাতীয় শব্দের বানানও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি বাংলা ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুমোদিত কোন সুনির্দ্দিষ্ট কারণ থাকে তাহা হইলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে। এই প্রকার কতকগুলি দৃষ্টান্ত ধরিয়া আলোচনা করা যাউক।

রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব—সংস্কৃত শব্দের বানানের জন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছিলেন, "অচোরহাভ্যাং দ্বে" (৮।৪।৪৬) অর্থাৎ 'র' 'হ' পরে থাকিলে 'যপ্' বা শ, ষ, স ব্যতীত সকল ব্যঞ্জনেরই বিকল্পে দ্বিত্ব হইবে। যেমন, 'অর্চনা', 'অর্চ্চনা'; 'অর্ধ' 'অর্দ্ধ'। এই রেফ-যুক্ত তৎসম শব্দের বাংলা বানানে কতকগুলি বিশেষ বর্ণে দ্বিত্বের রীতি প্রচলিত আছে। বাংলায় বিকল্পের রীতি নাই কিন্তু ইদানীং কেহ কেহ এই দ্বিত্ব বর্জ্জন

করিয়াছেন। ইহাতে একই শব্দের দ্বিবিধ বানান দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, 'কার্য্য' 'কার্য'; 'বর্ত্তমান', 'বর্তমান'; 'পূর্ব্বার্দ্ধ', 'পূর্বার্ধ'। বানানের এই দ্বৈত নিয়মে ভাষার সংহতি নষ্ট হয়। অতএব উহাদের মধ্যে একটি কি নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

সংস্কৃত ব্যাকরণে দ্বিত্বের বিকল্প বিধান থাকিলেও ইহা লেখকের স্বেচ্ছাচার মতই ব্যবহৃত হইত না। এই সম্পর্কে একটি সুন্দর নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখা যায়। যেমন,

(১) 'ক' বর্গের কোন সরেফ বর্ণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন, 'অর্ক', 'মূর্খ', 'স্বর্গ', 'অর্ঘ';

(২) 'ঝ' 'ণ' 'ন' 'প' 'ভ' 'হ' রেফ যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হয় না। যেমন, 'নির্ঝর', 'অর্ণ', 'দুর্নাম' 'সর্প', 'গর্ভ' 'অর্হ'।

(৩) 'ট' বর্গের কোন বর্ণ এবং 'ফ' রেফ-যুক্তই হয় না।

(৪) সংস্কৃতে অন্তঃস্থ বর্ণ দ্বিত্ব হয় না। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ 'য' ও অন্তঃস্থ 'ব' বর্গীয় বর্ণের মত উচ্চারিত হয় বলিয়া বাংলা বানানে তাহারাও রেফ-যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাণিনি বিকল্পের বিধান দিলেও ব্যবহারতঃ উল্লিখিত কতকগুলি বর্ণ নিয়মিত ভাবেই দ্বিত্ব হইতেছে না। কেবল, 'চ', 'ছ', 'জ', 'ত', 'দ', 'ধ', 'ব', 'ম' এই কয়টি বর্ণের বেলায়ই, দ্বিত্ব হইতেছে। এই নিয়মটি সর্ব্বতোভাবেই ধ্বনিতত্ত্বানুমোদিত (phonological)। ইহার বিস্তৃত বর্ণনায় প্রয়োজন নাই, তবে এই নিয়মানুসারেই আরও দুইটি বর্ণ হইতে দ্বিত্বের উচ্ছেদ হইতে পারে। বর্ণ দুইটি 'ছ' ও 'ধ'। মহাপ্রাণ বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণতঃ অসম্ভব। অতএব এই দুইটি বর্ণ হইতে বাংলায় দ্বিত্ব ত্যাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত যে সমস্ত বর্ণ সংস্কৃত ভাষার জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে

দ্বিত্ব হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের সহসা অঙ্গহানি করা সমীচীন নহে। কারণ এই নিয়মটি নিতান্তই স্বেচ্ছাচার-প্রসূত নহে।

এই দ্বিত্বের রীতি কোথা হইতে আসিল ? মনে হয় এই দ্বিত্ব সংস্কৃতে উচ্চারণানুযায়ী (phonetic) বানানের অন্যতম নিদর্শন।* কারণ রেফ-যুক্ত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনকে স্বাভাবিক উচ্চারণ হইতে অধিকতর জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে 'নিরজন' ও 'নির্জ্জন'এর উচ্চারণ এক নহে। শেষোক্ত স্থলে 'জ'কে একটু জোর দিয়াই উচ্চারণ করা হয়। বর্ণের উচ্চারণে এই জোরটুকু বুঝাইবার জন্যই দ্বিত্ব করাও অসম্ভব নহে। যাই হউক, তাহা হইলে সংস্কৃত বানানের রীতি ও বাংলা উচ্চারণ এই উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের জন্য এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে, একমাত্র 'চ' 'জ' 'ত' 'দ' 'ব' 'ম' 'য' রেফযুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইবে, অন্য কোন বর্ণ দ্বিত্ব হইবে না।

অনুস্বার—একমাত্র স্বরের 'অনু' অর্থাৎ পশ্চাৎ যে অনুনাসিকের উচ্চারণ হয় তাহাকে অনুস্বার বা অনুস্বর বলে। সংস্কৃতে ইহার অত্যন্ত ব্যাপক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি অনু-নাসিক ব্যঞ্জনের অধিকার অনেকস্থলে খর্ব্ব করিয়া পাণিনি অনুস্বার ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন (W. D. Whitney's Sanskrit Grammar, 70 f.)। কিন্তু বাংলায় দেখিতে পাই যথাস্থানে অনুনাসিক ব্যঞ্জনের মর্য্যাদা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে মূল সংস্কৃত শব্দের সহিত বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের আকৃতিগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। যেমন, সংস্কৃত 'সংকল্প' 'শংখ' 'সংগ' ইত্যাদি বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া 'সঙ্কল্প', 'শঙ্খ' 'সঙ্গ' হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দি সংস্কৃতের

* ইংরেজিতে স্থল-বিশেষে ব্যঞ্জনের দ্বিত্বের বিধি আছে; যেমন,—**Worship, worshipper, worshipped; refer, referred; regret, regretted**—ইহাও ধ্বনিজ।

অনুযায়ী ব্যাপক অনুস্বার ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। কিন্তু বাংলায় সমস্ত স্পর্শবর্ণেই ব্যঞ্জন-পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বার লুপ্ত হইয়া তৎস্থলে তত্তৎবর্গের অনুনাসিকই ব্যবহৃত হইতেছে। বাংলা বানানের সংস্কারপন্থীদিগের কেহ কেহ উভয়কূল রক্ষা করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বিকল্পে উভয় বিধানই গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। কেহ আবার বাংলা ধ্বনি-তত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া সংস্কৃতের বিধান একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে চাহেন। কিন্তু এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ব্যাকরণে বিকল্পের বিধান যত অল্প থাকে ততই ভাল এবং তৎসম শব্দের বানানের নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের নির্দ্দেশই মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইংরেজি শব্দকোষে ইতালীয়, ফরাসি প্রভৃতি বহু শব্দ প্রচলিত আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত শব্দের বানান ইংরেজি উচ্চারণানুযায়ী সংস্কার করিয়া লওয়া হয় নাই, তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশেরও অত্যন্ত সুবিধা হয়। অতএব 'সংকল্প' 'শংখ' 'সংগ' বানানই বাংলায়ও গ্রাহ্য ;- ইহার ব্যতিক্রম গ্রাহ্য নহে। তবে এযাবৎকাল ইহার ব্যতিক্রমগুলিও যখন গ্রাহ্য হইয়া আসিয়াছে তখন তাহাদিগকে প্রাচীন প্রয়োগ (archaic form) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বিসর্গ—সংস্কৃত বর্ণমালায় বিসর্গও একটি স্বাধীন বর্ণ নহে। ইহাকে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে 'আশ্রয়স্থানভাগী'; অর্থাৎ যে বর্ণকে ইহা আশ্রয় করিয়া থাকে ইহা তাহারই উচ্চারণে সাহায্য করে মাত্র। বাংলায় তৎসম শব্দের বানানে পদান্তস্থ প্রায় সমস্ত বিসর্গই লুপ্ত হইয়াছে। যেমন, 'মন' (মনঃ) 'যশ' (যশঃ) 'শির' (শিরঃ)। তবে সমাসবদ্ধ পদের মধ্যস্থ বিসর্গ লুপ্ত হয় নাই ; যেমন, 'পুনঃপুনঃ' 'প্রাতঃকাল', 'নভস্তল' ইত্যাদি। পদান্তস্থিত বিসর্গের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিলে সংস্কৃত শব্দের একটি বর্ণেরই উচ্ছেদ করা হয় ; কারণ, পদান্তস্থ বিসর্গ সর্ব্বত্রই একটি লুপ্ত 'স্' বা

'র' র স্থানাধিকারী। যেমন 'মনস্' (মনঃ) 'পুনর্' (পুনঃ)। অন্য কোন শব্দের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইলে এই গুপ্ত বর্ণগুলির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'মনস্তাপ', 'পুনরপি'। অতএব বাংলায় বিসর্গটি বর্জ্জন করিলে একটি অসুবিধা এই যে, শব্দগুলিকে হসন্তভ্রমে উচ্চারণে ভুল করা হয়; যেমন সংস্কৃত 'মনঃ' বিসর্গ বর্জ্জিত হইয়া লিখিত হয় 'মন' এবং উচ্চারণে হয় 'মন্'। ইহাতে বাংলা ওজনবাচক 'মণ'র সঙ্গে ইহার উচ্চারণে কোন পার্থক্য থাকে না, তাহা হইতেই বানানেও গোলযোগ উপস্থিত হয়, সন্ধিরও বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে।

অতএব এ'সব স্থলে বিসর্গ রক্ষা করাই উচিত। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর তৎসম শব্দেও এই বিসর্গ অক্ষুণ্ণ থাকিতেই দেখা যায়। যেমন,

"হানিলা কুসুম ধনুঃ টঙ্কারি' কৌতুকে"—মেঘনাদবধ (মাইকেল)
"রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে"—চতুর্দ্দশপদী (ঐ)
"আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক"—বৃত্রসংহার (হেমচন্দ্র)
"হে অশ্বত্থ বোধিদ্রুম ! মহাকালস্রোতঃ"—অমিতাভ (নবীনচন্দ্র)

হসন্ত—বাংলা উচ্চারণে শব্দের আদি বা উপান্ত স্বর ধ্বনিত (accented) বা দীর্ঘ করিবার জন্য অকারান্ত তৎসম শব্দের সাধারণতঃ অন্ত্য স্বর লুপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, 'জল' 'বন', সাধক', 'সমতল', ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের উচ্চারণে আদি কিম্বা উপধাবর্ণে জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়, সেই জন্য অন্ত্যস্বর পর্য্যন্ত ধ্বনি-সাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না; সেইজন্য শব্দগুলির অন্ত্যস্বর ('অ') উচ্চারিত হইতে পারে না। ইহা বাংলা উচ্চারণের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাংলা লিখন-সৌকর্য্যের জন্য এই প্রকার শব্দে হসন্তের চিহ্ন কদাচ ব্যবহৃত হয় না। বাহ্য আকৃতিতে শব্দগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ কিন্তু উচ্চারণতঃ প্রকৃতপক্ষে ইহারা বাংলা। উচ্চারণ ও বানানের এই পার্থক্যের জন্য

তৎসম শব্দের সন্ধি ও সমাসে নিত্য ভ্রান্তি ঘটিতেছে। অনেকের ধারণা, এমন ক্ষেত্রে হসন্ত-চিহ্নটি ব্যবহার করিলেই সকল বিড়ম্বনার অবসান হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব নহে। হসন্তপদ শব্দের সংখ্যা বাংলায় এত অধিক যে তাহাতে চিহ্ন প্রয়োগ করিতে গেলে লিখন এবং মুদ্রণের শ্রম অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তবে যে সব শব্দে সংস্কৃতেও হসন্ত-চিহ্নের প্রয়োগ হয় তাহাতে বাংলায় লিখিবার কালেও হসন্ত-চিহ্ন অপরিহার্য্য। যেমন, 'ধীমান্', 'আশিস্', 'চতুর্' ইত্যাদি। সংস্কৃতে হসন্ত উচ্চারিত হয় না, অথচ বাংলায় হসন্ত উচ্চারিত হয়, এমন স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত 'ক্ত', 'তস্', 'ড', 'ষ্ণেয়', 'অনীয়' প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের বাংলা উচ্চারণে অন্ত্য স্বর রক্ষিত হয়। যেমন, 'গত', 'ভীত', 'সতত', 'কার্য্যতঃ', 'গাঙ্গেয়', 'করণীয়', 'অগ্রজ', 'আত্মজ', 'খগ' ইত্যাদি।

শব্দের উপান্ত স্বর যদি 'ঐ' হয়, তবে অন্ত্যস্বর রক্ষিত হয় ; যেমন, 'বৈধ', 'বৈর', তৈল', 'শৈল' ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে অকারান্ত তৎসম শব্দের উচ্চারণে একটু পার্থক্য আছে। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গ হইতে অধিকতর হসন্ত-প্রবণ। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে 'তর' ও 'তম' প্রত্যয়ান্ত শব্দের (যেমন, 'গুরুতর', 'প্রিয়তম') অন্ত্যস্বর রক্ষিত হয় কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে ইহাদেরও অন্ত্যস্বর বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে 'কালীপদ' পূর্ব্ববঙ্গে 'কালীপদ্' (সেইজন্য ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কালীপদ'র ও 'কালীপদের' এই দ্বিবিধই প্রয়োগ পাওয়া যায়)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দের হসন্ত উচ্চারণ করা বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য। এমন কি অনেকগুলি অ-কারান্ত তৎসম শব্দশেষেও নূতন হসন্ত বিভক্তি যোগ করিয়া উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। যেমন, সংস্কৃত 'মত' খাঁটি

বাংলা উচ্চারণে 'মতন্'। উচ্চারণতঃ এই হসন্তের এতদূর বিস্তৃতি হইয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আ-কারান্ত ও ই-কারান্ত শব্দশেষেও হসন্ত বিভক্তি যোগ করিয়া বাংলা উচ্চারণানুযায়ী নূতন শব্দ গঠন করা হইতেছে। যেমন, 'নানান্' (নানা) 'রঙ্গিন্' (রঙ্গী)।

অনুজ (বা অর্বাচীন তৎসম) শব্দ

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দও সংস্কৃতের আকৃতিতে গঠিত হইতেছে। যেমন, 'বাড়রি'র যাঁহারা ওঝা (উপাধ্যায়) তাঁহারা এতকাল 'বাড়ুয্যা', 'বাড়ুয্যে', 'বাড়ুজ্জে' থাকিয়া 'বন্দ্যোপাধ্যায়' হইয়া গেলেন। 'চাটুয্যা' 'চাটুয্যে', 'চাটুজ্জে'রাই বা ছাড়িবেন কেন? তাহারাও দেখাদেখি হইলেন, 'চট্টোপাধ্যায়', 'গাঙ্গুলিরা'ও হইলেন 'গঙ্গোপাধ্যায়'। এই জাতীয় শব্দ বাহ্যতঃ সংস্কৃতের আকৃতিতে গঠিত হইলেও মূল প্রকৃতিতে তৎসম শব্দ নহে। ইহারা বাংলার আমলেই অতি আধুনিক কালে গঠিত এবং শুধু আকৃতি-সাম্যের জন্যই ইহারা তৎসমের মর্য্যাদা পাইতে পারে।

আধুনিক সভ্যতার উপযোগী ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বাংলা ভাষায় কতকগুলি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে ; ইহাদের আকৃতিও সংস্কৃতের অনুরূপ। যেমন, 'প্রাগৈতিহাসিক', 'কথাসাহিত্যিক', 'স্বায়ত্তশাসন', 'রক্ষণশীল', 'পৃষ্ঠপোষক' ইত্যাদি। কিন্তু মূল সংস্কৃত শব্দকোষের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত উভয়বিধ শব্দকে অনুজ শব্দ বা অর্বাচীন তৎসম শব্দ বলা যাইতে পারে।

কতকগুলি শব্দ আবার এমন আছে, যাহারা মূলতঃ সংস্কৃত হইতে জাত এবং প্রাকৃত শব্দ কিন্তু বাংলায় আসিয়া তাহারা তৎসম শব্দরূপেই গৃহীত হইতেছে। যেমন, 'প্রকট', 'বিকট', 'পুত্তল' (তাহা হইতে পুনরায় 'পুত্তলিকা', 'পৌত্তলিকতা' ইত্যাদি), 'খুর' ; (এমন কি এই প্রাকৃত শব্দটি সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃতের মর্য্যাদা লাভ

করিয়াছে—"ক্ষুণ্নানি হরিতাং খুরৈঃ"—কালিদাস, 'কুমারসম্ভবম্')। ইহা-দিগকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এই প্রকার সমস্ত শব্দেরই বানান-গঠনে সংস্কৃত ব্যাকরণেরই নির্দ্দেশ মানিয়া লওয়া হয়, সেইজন্য ইহাদের বানান সমস্যামূলক নহে। যে সমস্ত শব্দ মূলতঃ আদৌ সংস্কৃত নহে যেমন, 'চট্টোপাধ্যায়ের' 'চট্ট' তাহাদের বানানও যথাসম্ভব সংস্কৃতের ব্যাকরণানুযায়ীই হওয়া কর্ত্তব্য। এইভাবে তৎসম বানানের সমগ্র রীতিই একটি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা দ্বারা সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তনের সুবিধা হয়।

অৰ্দ্ধতৎসম শব্দ

তৎসম শব্দের প্রাদেশিক বা লৌকিক ধ্বনি-বিকৃতি (phonetic corruption) দ্বারা যে সমস্ত নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাদিগকে অর্দ্ধতৎসম শব্দ কহে। যেমন, 'ব্যাভার' (ব্যবহার), 'পাচিত্তির', 'পাচিত্তি' (প্রায়শ্চিত্ত), 'পেন্নাম' (প্রণাম)। এই সমস্ত শব্দের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা ভাষাতত্ত্বের মূল-নীতি অনুযায়ী ক্রমে পরিবর্ত্তিত না হইয়া তৎসম শব্দ হইতেই প্রাদেশিক উচ্চারণানুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহাদের জন্ম উচ্চারণমূলক এবং বাংলার বিভিন্ন প্রাদেশিক উচ্চারণে পার্থক্য হেতু একই তৎসম শব্দ বিভিন্ন অর্দ্ধ-তৎসম শব্দে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন, 'কান', 'কানু', 'কেষ্ট', 'কেষ্টা', 'কেষ্টো', 'কিষ্ণ', 'কিষ্ণা', 'কিষ্টা' (কৃষ্ণ)।

সমরূপ—অর্দ্ধতৎসম শব্দকে ইহাদের আকৃতি-বিভিন্নতার জন্য মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যে সমস্ত তৎসম শব্দ উচ্চারণে বিকৃত হইয়াও বাহ্যতঃ সংস্কৃতের আকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাদিগকে সমরূপ অর্দ্ধতৎসম বলা যাইতে পারে। যেমন, 'ইতিমধ্যে' (ইতঃমধ্যে), নিন্দুক (নিন্দক), 'ব্যবসা' (ব্যবসায়), 'নাগেশ্বর' (নাগকেশর), 'ভাদ্রবধূ' (ভ্রাতৃবধূ)। এই সমস্ত শব্দ মূলতঃ তৎসমের বিকৃত-উচ্চারণ-জাত হইলেও বাহ্যতঃ প্রকৃত তৎসম শব্দ বলিয়াই ভ্রম হয়। ইহাদের বানানও সর্ব্বতোভাবেই সংস্কৃতমূলকই হইয়া থাকে। অতএব তৎসম শব্দের বানানে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ইহাদের উপরও আরোপ্য।

বিষমরূপ--কিন্তু আর এক প্রকার অর্দ্ধতৎসম শব্দ আছে যাহাদের উচ্চারণ প্রাদেশিকতা-দুষ্ট ও অত্যন্ত বিকৃত বলিয়া বাহ্যতঃ তৎসমের কোন লক্ষণই প্রায় প্রকাশ পায় না। যেমন, 'ছরাদ্দ', 'ছরাদ', 'ছেরাদ্দ', 'হরাদ' (শ্রাদ্ধ); 'শীগ্‌গির'। কথ্য ভাষায়ই ইহাদের ব্যবহার অধিক, তবে কোন কোন শব্দের সাধুভাষায়ও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে বিষমরূপ অর্দ্ধতৎসম বলা যাইতে পারে। ইহাদের বানান সর্ব্বদাই উচ্চারণমূলক হইয়া থাকে, সেইজন্য ইহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট বানানের রীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। ইহাদের বানানই সমস্যা-মূলক ; তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সমস্ত শব্দের সাধুভাষায় ব্যাপক প্রচলন নাই, সেইজন্যই ইহাদের সমস্যা গুরুতর নহে। যে অল্পসংখ্যক বিষমরূপ শব্দের সাধুভাষায় প্রচলন আছে তাহাও সর্ব্বতোভাবে তদ্ভব (পরে দ্রষ্টব্য) শব্দের বানানের রীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে।

তদ্ভব শব্দ

যে সমস্ত শব্দ মূলতঃ সংস্কৃত শব্দ হইতে জাত হইয়া নিয়মিত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে তদ্ভব শব্দ কহে। যেমন, সংস্কৃত 'হস্ত' প্রাকৃত 'হত্থ' বাংলা 'হাত'; সংস্কৃত 'বৃদ্ধ' প্রাকৃত 'বড্‌ঢ' বাংলা 'বড়'। এই জাতীয় শব্দই ভারতীয় প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বঙ্গভাষায় এই সমস্ত শব্দের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহাদের বানানই সমস্যা-মূলক।

এই সমস্ত তদ্ভব শব্দের বানানের উপর মূল সংস্কৃত, প্রাকৃত, মাগধী-অপভ্রংশ ইত্যাদি যে যে ভাষার মধ্য দিয়া আসিয়া ইহারা বঙ্গভাষায় বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিরই অল্পবিস্তর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনতম বঙ্গভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দের বানানে মাগধী অপভ্রংশের প্রভাবই অধিক ছিল এবং ইহা একান্তই অস্বাভাবিকও নয়। কারণ তখন সবে মাত্র বঙ্গভাষা অপভ্রংশের গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। অতঃপর মধ্য-যুগের প্রথমভাগের বঙ্গভাষায় তদ্ভব শব্দের বানানে কিছু কিছু প্রাকৃতের প্রভাবও লক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সংস্কৃতের প্রভাব বাংলা শব্দের বানানেও দ্রুত বিস্তৃতিলাভ করিয়া প্রাকৃত প্রভাবকে পরাজিত করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে তদ্ভব শব্দগুলি যখন বঙ্গভাষার নিজস্ব সম্পদ তখন ইহাদের উপর আর প্রাকৃত কিম্বা সংস্কৃতের প্রভাব সমর্থন না

করিয়া ইহাদের জন্য একটা নিজস্ব উচ্চারণানুযায়ী বানানের রীতি স্থির করা আবশ্যক কি না।

সংস্কৃতের অনুযায়ী আমরা বাংলা বর্ণমালার মধ্যেও দ্বাদশটি স্বরবর্ণ ও ছয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান দিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসম শব্দের বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বাংলায় এই আটচল্লিশটি বর্ণের প্রয়োজন হইলেও তদ্ভব শব্দের বানানের জন্য এতগুলি বর্ণের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য কেহ কেহ বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যতদিন বাংলা শব্দকোষে অন্ততঃ একটি তৎসম শব্দেরও স্থান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই আটচল্লিশটি বর্ণকেই বাংলা বর্ণমালাতেও রক্ষা করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বাংলা তদ্ভব শব্দের বানানে সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রভাবের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য? যেমন, বাংলায় 'কায' (স 'কার্য্য') লেখা উচিত কি 'কাজ' (প্রা 'কজ্জ') লেখা উচিত? 'শেয' (স শয্যা) লেখাই কর্ত্তব্য কিম্বা 'শেজ' (প্রা 'শজ্জা') লেখা কর্ত্তব্য? মাগধী অপভ্রংশের প্রভাবের কথা না তুলিলেও চলে। কারণ, তাহার প্রভাব যাহা ছিল আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার চিহ্নমাত্র আর নাই। আধুনিক বানানে প্রাকৃতের প্রভাবও অতি সামান্য; তথাপি কতকগুলি শব্দ প্রাকৃত ও সংস্কৃত এই উভয়ের নির্দ্দেশ মানিতে গিয়া কোন বিশেষ নিয়মের শাসনে আসিতে পারিতেছে না।

একটা বিষয় এইস্থলে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও তদ্ভব শব্দের উপর প্রাকৃত বানানের প্রভাবই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, তথাপি বাংলা ভাষার জন্মকাল হইতেই সংস্কৃতের প্রাবল্যে প্রাকৃত কোন কালেই ইহার উপর কোন নিয়মিত প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নাই। তদুপরি বাংলায় যতই তৎসম শব্দের ব্যবহার বিস্তৃতিলাভ করিতেছে ততই প্রাকৃতের

সর্ব্ববিধ প্রভাব প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সংস্কৃতের সর্ব্বপ্রকার নিয়ম অনুসরণ করিবার প্রতি বাংলাভাষার একটা স্বাভাবিক প্রকৃতি জন্মিয়া গিয়াছে; ইহাতে বাংলার নিজস্ব উচ্চারণের মর্য্যাদা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হইলেও, ইহার গতিরোধ করিবার উপায় নাই। অতএব আধুনিক বঙ্গভাষার তদ্ভব শব্দের বানানে প্রাকৃতের স্থলে যাহাতে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বানান গঠন করা হয়, তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এইভাবে 'কায' 'শেষ' প্রভৃতি বানানই গ্রাহ্য। ইহা দ্বারা একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যস্থ হইয়া ভাষায় বানানের দ্বৈত-শাসনের অবসান করা যাইতে পারে। বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দীর্ঘস্বর—বাংলায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না, সমস্তই হ্রস্ব। কিন্তু সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘবর্ণগুলি আমরা তদ্ভবশব্দের বানানেও ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন, 'দীঘি' (স দীর্ঘিকা), 'সূতা' (স সূত্র) 'চূণ' (স চূর্ণ) ইত্যাদি। ইহাতে উচ্চারণের কোন পার্থক্য হয় না, তবে সংস্কৃতের নিষ্ঠা রক্ষিত হয়, এই মাত্র।

কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন যে, তদ্ভব শব্দে দীর্ঘ স্বর ব্যবহারের প্রয়োজন কি? সমস্তই উচ্চারণানুযায়ী হ্রস্ব করিয়া লইলে বানানের কাজও অত্যন্ত সহজ হইয়া আসে। ইহা সম্পূর্ণই যে যুক্তিসঙ্গত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বানানে দীর্ঘস্বরের ব্যবহার তৎসম শব্দের বেলায় আমরা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারি কিন্তু যাহা খাঁটি বাংলা শব্দ তাহার উপর খাঁটি বাংলা উচ্চারণানুযায়ী বানান প্রয়োগ করিতে দোষ কি?

প্রকৃতই ইহার বিরুদ্ধে ভাষাতত্ত্বসম্মত কোন যুক্তি নাই। কিন্তু আমাদের সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীল মন সাধারণতঃ প্রাচীন রীতির

যতদূর সম্ভব মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবারই পক্ষপাতী; অতএব এই উপদ্রব মানিয়া চলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তবে ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের যে সুবিধা হয় তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই দীর্ঘ স্বরগুলি সংস্কৃতের আমলেও যে কতদূর উচ্চারণে বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। কারণ, একই শব্দের অনেক সময় বিকল্পে হ্রস্ব- দীর্ঘ-যুক্ত দ্বিবিধ বানানই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, 'শ্রেণি', 'শ্রেণী'; 'বেণি', 'বেণী'; 'রাজি', 'রাজী'; 'ধমনি', 'ধমনী'; 'তরি', 'তরী'; 'ত্রুটি', 'ত্রুটী'; 'ধরণি', 'ধরণী'; 'ভঙ্গি', 'ভঙ্গী'; 'তনু', 'তনূ', 'চঞ্চু', 'চঞ্চূ'; 'হনু', 'হনূ'; 'শম্ভু', 'শম্ভূ'; 'শম্বুক', 'শম্বূক'; 'ভল্লুক', 'ভল্লূক' ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে এই সমস্ত শব্দের উচ্চারণের কোন স্থিরতা ছিল না। সংস্কৃত পদ্যে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রতি কবিদিগের এত সূক্ষ্ম সতর্কতা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তৎকালীন শব্দমাত্রেরই উচ্চারণে এই রীতি প্রচলিত ছিল। কারণ, কবিতার উচ্চারণ সর্ব্বদাই কৃত্রিম। মনে হয়, এই দীর্ঘস্বরের অতি অল্পই উচ্চারণ হইত; তবে দুই হ্রস্বস্বরের সন্ধিস্থান কিম্বা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য বৈয়াকরণেরা ইহাকে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অতএব ভারতীয় ভাষাসমূহের বানানে দীর্ঘস্বরের এই অন্যায্য স্থানাধিকার অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট নিজের এতটুকু ঋণ স্বীকার করিলেও উত্তমর্ণের এই অত্যাচারটুকু তাহার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের জন্যও বানানে ইহাকে রক্ষা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। অতএব তদ্ভব শব্দেও সংস্কৃত-ব্যুৎপত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘস্বরের ব্যবহার কর্ত্তব্য।

দন্ত্য 'ন' ও মূর্দ্ধন্য 'ণ'—প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা তাহাদের বর্ণমালা

হইতে দন্ত্য 'ন' র উচ্ছেদ করিয়া মূর্দ্ধন্য 'ণ' কে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে তৎকালে দন্ত্য 'ন' র উচ্চারণ হইত না, মূর্দ্ধন্য 'ণ'রই উচ্চারণ হইত। প্রাকৃত বর্ণমালা তৎকালীন উচ্চারণানুযায়ী গঠিত, সেইজন্য তাহারা মূর্দ্ধন্য 'ণ'রই ব্যবহার করিয়াছেন।

আধুনিক ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহেও দন্ত্য 'ন'র বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয় না, প্রকৃত পক্ষে মূর্দ্ধন্য 'ণ'রই উচ্চারণ হয়। ইহা একটু সামান্য পরীক্ষা করিলেই আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। 'ত' হইতে 'ধ' পর্য্যন্ত বর্ণগুলি আমরা জিহ্বাগ্রদ্বারা দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি ; কিন্তু 'ন' উচ্চারণ করিবার কালে একটু অনুভব করিলেই বুঝিতে পারি যে, সহসা জিহ্বাগ্রভাগ পশ্চাদ্দিকে সরিয়া গিয়া মূর্দ্ধন্য বর্ণের উচ্চারণ-স্থানে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর 'ট' হইতে 'ঢ' পর্য্যন্ত বর্ণগুলি মুখগহ্বরে যে স্থানে উচ্চারিত হইয়া থাকে, মূর্দ্ধন্য 'ণ'ও অক্লেশে একই স্থানে উচ্চারিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চারণতঃ বাংলায় দন্ত্য 'ন' নাই, মূর্দ্ধন্য 'ণ'ই আছে। অতএব শব্দে যাঁহারা দন্ত্য 'ন' ও মূর্দ্ধন্য 'ণ'র মধ্যে একটিকে রক্ষা করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা প্রাকৃতের বিধানানুযায়ী মূর্দ্ধন্য 'ণ'কেই রক্ষা করিতে পারেন, দন্ত্য 'ন'কে নয়।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন ('শব্দ কথা') যে, আমরা দন্ত্য ও মূর্দ্ধন্য অনুনাসিকের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করি না সত্য, কিন্তু যখনই যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ করিতে যাই তখনই এই উভয় অনুনাসিকের উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারি। অর্থাৎ তাঁহার মতে 'শান্ত' উচ্চারণ করিবার কালে দন্ত্য 'ন' ও 'ঘণ্টা' উচ্চারণ করিবার কালে প্রকৃতই মূর্দ্ধন্য 'ণ'র উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাও সত্য নহে। 'শান্ত' শব্দের দ্রুত উচ্চারণে অনুনাসিকের উপর তাহার পরবর্ত্তী দন্ত্য বর্ণের

('ত' র) উচ্চারণাভাস সংক্রমিত হইলেও ধীরভাবে উচ্চারণ করিলে দেখা যাইবে যে 'শান্ত'র 'ন'র উচ্চারণস্থান প্রকৃতপক্ষে দন্ত নয়, ইহা মূর্দ্ধা। যেমন, 'শা-ন্-ত'।

প্রাকৃতের উচ্চারণ হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় ভাষাসমূহের উচ্চারণ হইতে দন্ত্য অনুনাসিকের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। আর্য্যেরা এ দেশে আসিবার সময় বাহির হইতে দন্ত্য অনুনাসিকেরই উচ্চারণ লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ভারতীয় অনার্য্যদিগের সহিত সংমিশ্রণের ফলে এই দন্ত্য 'ন'র উচ্চারণ লুপ্ত হইয়াছে। কারণ ভারতীয় অনার্য্যভাষা (দ্রাবিড়) মূর্দ্ধন্য বর্ণ-ধ্বনি-প্রবণ ছিল।

কিন্তু আধুনিক ভাষাসমূহের বর্ণমালায় সংস্কৃতের প্রভাব বশতঃ দন্ত্য 'ন' আসিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি প্রাকৃত ও অপভ্রংশে মূর্দ্ধন্য 'ণ'র সর্ব্বত্র ব্যবহার দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা "ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ" ইহাই মনে করিতেন। এইভাবে পণ্ডিতি বাংলা এই ণত্ব অতি সতর্কতার সহিত, কেবলমাত্র যেখানে সংস্কৃতের নির্দ্দেশ আছে সেই প্রকার ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যেমন, 'কাণ' (কর্ণ) 'সোণা' (স্বর্ণ)।

কিন্তু ক্রমে দন্ত্য 'ন' র প্রভাব এতই বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল যে ব্যুৎপত্তির উপরও লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা তর্ক করিতে লাগিলেন যে, সংস্কৃতের শব্দে যে কারণে মূর্দ্ধন্য 'ণ' হয়, সেই কারণ যদি তদ্ভব শব্দে না থাকে তবে আর তদ্ভব শব্দেই বা মূর্দ্ধন্য 'ণ'র বিড়ম্বনা কেন ? অতএব 'কান' (কর্ণ) 'সোনা' (স্বর্ণ) এই প্রকার বানানই গ্রাহ্য। এমন কি 'বানান' শব্দটির বানান লইয়াও এই

গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্দ্ধন্য 'ণ' দিয়া 'বাণান-সমস্যা'র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দন্ত্য 'ন' দিয়া 'বাংলা বানানের নিয়ম' গঠন করিয়াছেন। বানানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যখন দন্ত্য 'ন' ব্যবহারের দিকে তখন তাহাকে রোধ করিবার উপায় নাই।

সংস্কৃত ণত্ব বিধানের নিয়মটি সর্ব্বতোভাবে ভাষাতত্ত্বানুমোদিত; কারণ, 'ঋ', 'র', 'ষ' এই বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্থান প্রায় মূর্দ্ধা, সেইজন্য শব্দমধ্যে ইহারা পূর্ব্বে থাকিলে পরবর্ত্তী অনুনাসিক ব্যঞ্জনেও মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ সংক্রমিত হইতে বাধ্য। সেইজন্য তদ্ভব শব্দেও এই সব স্থলে মূর্দ্ধন্য 'ণ' দিয়াই বানান করা উচিত। যেমন, 'রাণী' (রাজ্ঞী) 'রান্না' (রন্ধন) ইত্যাদি। এইভাবে সংস্কৃতের প্রতি আমাদের যে কেবল নিষ্ঠা প্রদর্শিত হয় তাহা নহে, ধ্বনিতত্ত্বেরও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু তদ্ভব শব্দে যে ক্ষেত্রে ণত্ব-বিধি পালনের কারণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সেখানে আর অনাবশ্যক মূর্দ্ধন্য 'ণ'র প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব 'কান' (কর্ণ) 'সোনা' (স্বর্ণ) 'গিন্নী' (গৃহিনী) এই প্রকার বানানই গ্রাহ্য।

সংস্কৃতের একটি নিয়ম আছে যে 'ঋ' 'র' 'ষ'র পরবর্ত্তী হইলেও পদান্তস্থিত দন্ত্য 'ন্' মূর্দ্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন, 'নরান্'; বাংলা তদ্ভবশব্দেরও এই নিয়মটি গ্রহণ করা উচিত, অতএব 'তিনি করেণ', 'আপনি করুণ', না লিখিয়া 'করেন', 'করুন'ই লেখা উচিত। ইহার একটি কারণ এই যে স্বরবর্জ্জিত ব্যঞ্জনের প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ উচ্চারণ হয় না। সেইজন্য ঐ জাতীয় শব্দে 'ঋ' 'র' 'ষ' থাকিলেও পরবর্ত্তী অনুনাসিকের উচ্চারণ-ক্ষেত্রে পূর্ব্বোচ্চারিত মূর্দ্ধন্য বর্ণের পরিপূর্ণ প্রভাব কার্য্যকরী হইতে পারে না।

ড'য় বিন্দু ড়—আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে ট বর্গের কোন বর্ণ অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য বর্ণ উচ্চারণ করিতেন না; পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় অনার্য্য ভাষার সংমিশ্রণে আসিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য বেদ ও উপনিষদের ভাষায় মূর্দ্ধন্য বর্ণের উচ্চারণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পাণিনি যখন সংস্কৃতের ব্যাকরণ গঠন করেন তখন এই বর্ণগুলির ব্যবহার এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি ইহাদিগকে সংস্কৃত বর্ণমালায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ দ্বারা সংস্কৃতের বিকৃতি-পথ রুদ্ধ হইল সত্য কিন্তু ভাষার নিজস্ব গতি-প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নই রহিয়া গেল। তাহারই ফলে প্রাকৃত ভাষায় অসংস্কৃত যে কতকগুলি বর্ণের উদ্ভব হইল মূর্দ্ধন্য বর্ণের শ্রেণীভুক্ত 'ড়' তাহাদের অন্যতম।

কোন অনার্য্য (দ্রাবিড়) ভাষার প্রভাববশতঃ বাংলা তদ্ভব শব্দে 'ড়'র অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন হইতেছে। সংস্কৃতের প্রতি নিষ্ঠা দেখাইতে গিয়া ভাষার এই স্বাভাবিক গতি রোধ করিবার কোন কারণ নাই এবং তাহা সম্ভবও নহে; সেইজন্য সাধু উচ্চারণানুযায়ী নিয়মিত ভাবে 'ড়'র ব্যবহারকে তদ্ভব শব্দের বানানে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে তদ্ভব শব্দে 'ড়'র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) মূল শব্দে ট বর্গের কোন বর্ণ থাকিলে তৎস্থলে তদ্ভব শব্দে 'ড়' হয়। যেমন, 'কাপড়' (কর্পট), 'পড়া' (পঠন), 'ওড়' (ওড্র)।

(২) মূল শব্দে ত বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ থাকিলে তৎস্থলে তাহার তদ্ভব শব্দে 'ড়' হয়; যেমন, 'পড়া' (পতন), 'হাড়' (অস্থি), 'মাড়া' (মর্দ্দন)।

(৩) মূল শব্দে 'ঞ্জ' থাকিলে তৎস্থলে তাহার তদ্ভব শব্দে 'ড়' হয়; যেমন, 'সাড়া' (সংজ্ঞা), 'ঝড়' (ঝঞ্ঝা)।

পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'ড়'র উচ্চারণ একেবারে নাই, তৎস্থলে অন্তঃস্থ বর্ণ 'র'রই উচ্চারণ হয়। বাংলার পশ্চিম-সীমান্তে সর্ব্বত্রই প্রায় 'ড়'র উচ্চারণ হয়, 'র'র হয় না। সেইজন্য এই দুই অঞ্চলের লেখকমাত্রেরই অসতর্ক বানানে এই 'র' ও 'ড়'র বড় গোল রহিয়া যায়। একমাত্র সাধু উচ্চারণ ও উল্লিখিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই ভ্রান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

ঙ্গ, ঙ, অনুস্বার—সংস্কৃত সংযুক্ত বর্ণ 'ঙ্গ'র স্থলে বাংলা তদ্ভব শব্দে 'ঙ' ও 'ং' এই দুইই লিখিবার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন, 'রং', 'রঙ্' (রঙ্গ); 'বাংলা', বাঙ্লা (বাঙ্গালা); 'গাং', 'গাঙ্' (গঙ্গা) ইত্যাদি। এই উভয় রীতির মধ্যে অবশ্য একটিই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

লিখন-সৌকর্য্যের জন্য অধিকাংশ স্থলেই এইসব ক্ষেত্রে অনুস্বার লিখিত হইয়া থাকে ; কিন্তু 'ঙ'র প্রকৃত উচ্চারণ যে কি সেই সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার জন্য 'ঙ'ও যথেচ্ছ ব্যবহার হইতেও বড় কম দেখা যায় না।

'ঙ্গ' এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনটির মধ্যে একটি বর্ণ ক বর্গের অনুনাসিক 'ঙ' ও অপরটি এই বর্গেরই তৃতীয় বর্ণ 'গ'। কণ্ঠ্য ও তালব্য বর্ণের অনুনাসিক দ্বয়ের এই বিশেষত্ব যে তাহাদের স্বাধীন উচ্চারণ নাই। তাহারা স্ব বর্গের কোন না কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত না হইলে প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। মধ্যযুগের বাংলার বানানে 'ঞ'কে স্বর-সংযুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া (যেমন, 'গোসাঞি', 'মুঞি',) অনেক মনে করিতে পারেন যে, ইহারা বুঝি স্বাধীন ব্যঞ্জন ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ যুগের বানান নির্দ্দোষ ছিল না।

'ঙ' র প্রকৃত উচ্চারণ 'উঅ' এবং 'ঞ'র উচ্চারণ 'ইঅ'; অতএব যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের 'ঙ্গ' স্থলে 'ঙ' ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের শব্দগুলির এই প্রকার উচ্চারণ হয়, 'রউঅ' (রঙ্), 'বাউঅলা' (বাঙ্লা), 'কাউআল' (কাঙাল); কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলির স্বতন্ত্র প্রকার উচ্চারণ করি এবং তাহা অনুস্বার দিয়া লিখিলেই যথাযথ প্রকাশ পাইয়া থাকে; যেমন, 'রং' (রঙ্গ), 'বাংলা' (বাঙ্গালা)।

অনেকে 'ঙ' ও 'ঞ' কে স্বর-সংযুক্ত করিয়া ইহাদিগকে স্বাধীন ব্যঞ্জনের অনুরূপ বানান করিবার পক্ষপাতী। যেমন, 'শাঙন' (শাউঅন), 'গোঙাইনু' (গোউআইনু) 'ডেঞে' (ডেইএ)। কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায় এইসব ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া পরবর্ত্তী অনুনাসিকের স্বর-ধ্বনি মাত্র রক্ষা করিলেই চলে; যেমন, 'শাঁওন', 'গোঁয়াইনু', 'ডেঁয়ে'; ইহাতে উচ্চারণের কোন পার্থক্য হয় না; কারণ, উচ্চারণতঃ অনুনাসিক শব্দের আদি বর্ণেই সংক্রমিত হইয়া আসে এবং পরবর্ত্তী বর্ণে তাহার আভাস মাত্র রক্ষিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেহেতু উক্ত অনুনাসিকদ্বয় সংস্কৃতেও স্বাধীন ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয় না, সেই জন্য ইহাদিগকে বাংলাতেও স্বর-সংযুক্ত করিয়া বানান গঠন করা সঙ্গত নহে।

উষ্ম বর্ণ—মাগধী প্রাকৃতে সংস্কৃত 'শ' 'ষ' 'স' এই তিনটী উষ্ম বর্ণের মধ্যে উচ্চারণানুযায়ী তালব্য 'শ'কেই রক্ষা করা হইয়াছিল। সংস্কৃতেও এই তিনটি উষ্মবর্ণের সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র উচ্চারণ হইত কিনা এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। কারণ, কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বানানে বিকল্পে দুই এমন কি কোথাও তিনটি উষ্মবর্ণেরই প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যেমন, 'সেফালিকা', 'শেফালিকা'; 'কিসলয়', 'কিশলয়', 'কিষলয়';

'কলস', 'কলশ' ; 'কুসীদ', 'কুশীদ', 'কুষীদ' ; 'কেশর', 'কেসর' ; 'সূর্প', 'শূর্প' ; 'বসিষ্ঠ', 'বশিষ্ঠ' ; 'কংস', 'কংশ' ; 'সর্ব্বরী', 'শর্ব্বরী' ; 'কশা', 'কষা' ; 'উষীর', 'উশীর' ইত্যাদি। একই অর্থে একই শব্দ যে ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হইত তাহা মনে হয় না। যে ভাবেই বানান লেখা হউক উচ্চারণ এক প্রকার হইত ; অতএব মনে হয়, সংস্কৃতেও এই উষ্মবর্ণগুলির স্বতন্ত্র উচ্চারণ রক্ষিত হইত না।

বাংলাতেও এই তিনটি উষ্মবর্ণই উচ্চারিত হয় না, একটিই হয়—পূর্ব্ববঙ্গে ও ভাগীরথী-তীরের ভাষায় তালব্য 'শ' এবং বাংলার পশ্চিম সীমান্তের ভাষায় দন্ত্য 'স'।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বানানে মাগধী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব-বশতঃ তালব্য 'শ' ই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আধুনিক বাংলা তদ্ভব শব্দের বানানে সংস্কৃতের প্রভাব-বশতঃ ব্যুৎপত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তিনটি উষ্মবর্ণ ই ব্যবহৃত হইতেছে ; যেমন, 'বাঁশী' (বংশী) ; 'সরিষা' (সর্ষপ) 'কাঁসা' (কাংস্য)। কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রাকৃতের প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখা যায় ; যেমন, 'শালিক' (সারিকা)।

শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সুবিধার জন্য সর্ব্বত্র সংস্কৃতের আদর্শেই তদ্ভব শব্দের বানান গঠিত হওয়া আবশ্যক। যেসব আধুনিক বানানে প্রাকৃতের প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে সেইসব বানানকে বিকল্পে শুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সংস্কৃতানুরূপ বানানও গঠন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যেমন, 'শালিক' 'সালিক' (সারিকা)।

বাংলা ব্যতীত হিন্দি মৈথিলি প্রভৃতি ভাষায় মূর্দ্ধন্য 'ষ'কে 'খ' উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। যেমন, 'নিমিখ' (নিমেষ), 'বরখা' (বরষা) ; বাংলায় 'ষ' র উচ্চারণ 'শ' বা 'স' হইতে অভিন্ন বলিয়া এই রীতি প্রচলিত নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ('শব্দকথা'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) যে, যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণে আমরা তিনটি উষ্মবর্ণকেই স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারণ করিতে পারি। অর্থাৎ দন্ত্য বর্ণের সহিত দন্ত্য, মূর্দ্ধন্য বর্ণের সহিত মূর্দ্ধন্য ও তালব্য বর্ণের সহিত তালব্য 'শ'-রই আমরা উচ্চারণ করি। যেমন, 'স্থল', 'কষ্ট', 'নিশ্চয়'। (কিন্তু 'প্রশ্ন'র উচ্চারণে উষ্মবর্ণ দন্ত্য 'ন' যুক্ত হইয়াও তালব্য উচ্চারিত হয়।) তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, এই শব্দগুলির উষ্মবর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য আছে।

কিন্তু যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-ধ্বনি হইতে কোন বর্ণ-বিশেষের অবিমিশ্র উচ্চারণ-পরিচয় পাইবার উপায় নাই। যেমন, 'স্থল' উচ্চারণ করিবার জন্য যখন আমরা প্রথম উষ্মবর্ণের উচ্চারণ করিতে যাই তখনই ইহাতে সংযুক্ত 'থ'র দন্ত্য উচ্চারণাভাস আসিয়া সংক্রমিত হইয়া পড়ে। অনুনাসিক ব্যঞ্জনের আলোচনায়ও আমি এই প্রকার ধ্বনি-সংক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অতএব কোন বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ-পরিচয় পাইতে হইলে ইহাকে স্বাধীনভাবে উচ্চারণ করিয়াই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যুক্ত বর্ণের যুগ্ম উচ্চারণ-ধ্বনি হইতে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে ণত্ববিধির ভাষাতত্ত্বানুমোদিত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। এইবার ষত্ববিধির বিষয় একটু আলোচনা করিব।

সংস্কৃতের নিয়ম এই যে, 'অ' 'আ' ভিন্ন স্বর ও 'ক' ও 'র' র পরে পদমধ্যে 'স' ('শ' নয়) 'ষ' হয়। যেমন, 'নদীষু'। এইখানে বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার ক্রিয়া একটু স্মরণ করিতে হইবে।

'অ' 'আ' উচ্চারণ করিবার কালে জিহ্বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রায় দন্তমূলের নিকটবর্ত্তী থাকে, অতঃপর দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করিতে জিহ্বাকে বিন্দুমাত্রও বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু 'ক' ও 'র' কিম্বা 'অ' 'আ'

ব্যতীত স্বর উচ্চারণ করিয়া জিহ্বার পক্ষে দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করা কষ্টকর এবং মূর্দ্ধন্য 'ষ' উচ্চারণ করাই সহজ। কারণ, এই বর্ণগুলির উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধারই সংলগ্ন। উচ্চারণ-বিজ্ঞান-সম্মত ষত্বের এই বিধি তদ্ভব শব্দের বানানেও পালন করিলে সংস্কৃতের প্রতি যে অন্ধ গোঁড়ামি প্রদর্শিত হইবে তাহা নহে, ইহা দ্বারা বিজ্ঞানানুমোদিত একটি নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করায় বানানে ব্যভিচারের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইবে।

বর্গীয় জ, অন্তঃস্থ য—প্রাকৃতে অন্তঃস্থ বর্ণ 'য' ছিল না, স্পর্শবর্ণ বর্গীয় 'জ' ই ছিল। ইহা দেখিয়া অনুমান করা স্বাভাবিক যে প্রাকৃতের যুগে হয়ত অন্তঃস্থ 'য'র উচ্চারণ হইত না। কিন্তু মধ্যভারতের আধুনিক ভাষা হিন্দিতে সংস্কৃত-অনুযায়ী অন্তঃস্থ বর্ণেরও উচ্চারণ হইয়া থাকে। প্রাকৃতের যুগে এই বর্ণের উচ্চারণ না থাকিলে আধুনিক ভাষায় ইহা কোথা হইতে আসিল?

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতের যুগেও হিন্দি প্রদেশে অন্তঃস্থ 'য'র উচ্চারণ হইত, তবে প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা তাঁহাদের ভাষার সরলতা সম্পাদনের জন্য বোধ হয় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বর্গীয় 'জ'কেই রক্ষা করিয়া অন্তঃস্থ 'য'কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রাকৃত ভাষার উপর প্রাচ্য কোন ভাষার প্রভাবও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

বাংলায় স্পর্শ বর্ণ বর্গীয় 'জ'ই উচ্চারিত হয়, অন্তঃস্থ 'য' উচ্চারিত হয় না। এই অনুযায়ী প্রাচীন ও মধ্য যুগের বানানে ব্যাপকভাবে বর্গীয় 'জ'র ব্যবহারই দেখিতে পাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-ব্যুৎপত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বানান-গঠনের প্রবৃত্তি জন্মলাভ করিল এবং তখন হইতেই প্রাকৃতানুযায়ী বর্গীয় 'জ'র ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আধুনিক বাংলার

বানানে অতি সামান্য কয়েকটি শব্দে এখনও প্রাকৃতের প্রভাবজাত বর্গীয় 'জ'র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, 'কাজ' (কার্য্য), 'জোড়' (যুগ্ম), 'শেজ' (শয্যা) ইত্যাদি। ইহাদেরও সংস্কৃতের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানান হওয়া কর্ত্তব্য, যেমন 'কায', 'যোড়', 'শেয'।

চন্দ্রবিন্দু—সংস্কৃতে দুই বিভিন্ন শব্দের সন্ধির ফলে যদি কোন অনুনাসিক বর্ণ লুপ্ত হইত তবে সেই লুপ্ত অনুনাসিকের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত হইত ; যেমন, 'মহান্+'লাভ', 'মহাঁল্লাভ'। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতে স্বাধীন শব্দের কোন বর্ণে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার হইত না। প্রাকৃত ভাষা হইতেই স্বাধীন শব্দে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার আরম্ভ হয়। আধুনিক বাংলা শব্দে ইহার অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে।

চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ রাঢ়ের ভাষারই বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা একেবারেই অপ্রচলিত। ভাগীরথীতীরস্থ লোকের ভাষা এই দুই'এর মাঝামাঝি। উচ্চারণের এই বিভিন্নতাই বানানের স্বেচ্ছাচারিতার হেতু।

চন্দ্রবিন্দু মাগধী অপভ্রংশের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। লিপিকারদিগের ভ্রান্তিবশতঃ প্রাচীনতম বাংলায়ও স্থানে অস্থানে ইহার অত্যন্ত ব্যাপক ব্যবহার করা হইয়াছে। রাঢ়ের ভাষায় লিখিত পুঁথিতে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) তদ্দেশীয় উচ্চারণের গুণে চন্দ্রবিন্দুর আর অন্ত পাওয়া যায় না।

তদ্ভব শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের একটা নির্দ্দিষ্ট রীতি যে নাই তাহা নহে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দুযুক্ত শব্দ অনেক সময়ই উচ্চারণমূলক বলিয়া সর্ব্বত্র নিয়মের নির্দ্দেশ করা দুরূহ। একটি কি দুইটি ব্যাকরণানুমোদিত কারণ ব্যতীত চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সর্ব্বত্রই উচ্চারণজাত। কারণ, বাংলা ভাষার

বর্ত্তমান রাঢ়যুগে শব্দে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার একটা বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি ইহার ব্যবহারে সাধারণতঃ যে নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক হইলে রাঢ়- ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী উভয়েই বর্ণাশুদ্ধির হাত হইতে কতক নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।

(১) সংস্কৃত শব্দ হইতে যদি কোন অনুনাসিক বর্ণ কিম্বা অনুস্বার লুপ্ত হইয়া কোন তদ্ভব শব্দ গঠিত হয় তাহা হইলে লুপ্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত হয়। 'আঁক' (অঙ্ক), 'আঁচল' (অঞ্চল), 'কাঁটা' (কণ্টক), 'দাঁত' (দন্ত), 'কাঁপা' (কম্প), 'বাঁশী' (বংশী); ব্যতিক্রম—'চাউল' (তণ্ডুল), 'বিশ' (বিংশ)।

(২) সংস্কৃত যুক্তাক্ষর-গঠিত শব্দের তদ্ভবে যদি একটি বর্ণ রক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে কথনও কথনও চন্দ্রবিন্দুর আগম হয়; যেমন, 'আঁখি' (অক্ষি), 'পুঁথি' (পুস্তক)। একটি লুপ্ত বর্ণের স্থান অধিকার বা পূরণ করে বলিয়া ইহাকে পূরণ-বাচক অনুনাসিক কহে।

(৩) শব্দমধ্যে একই ব্যঞ্জন বর্ণ পর পর উচ্চারিত হইলে তজ্জনিত ধ্বনির একঘেয়েমি দোষ দূর করিবার জন্য শব্দের আদিবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, 'কাঁফর' (বা কাঁপর), 'চুঁচুড়া', 'পেঁপে', ঝিঁঝি।

(৪) নিয়মিত চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কোন শব্দের প্রতি অলীক সামঞ্জস্য-হেতু কোন কোন শব্দে চন্দ্রবিন্দুর আগম হয়, যেমন, 'পাঁচন', 'কাঁচ'।

(৫) অনুনাসিক কিম্বা অনুনাসিকের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ কদাচ চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত হয় না। যেমন, 'মাজন' (মঞ্জন), 'লাফ' (লম্ফ), 'চাম' (চর্ম্ম), 'শামর' (শম্বর), 'ইনি' 'তিনি' (সম্ভ্রমার্থক), কিন্তু 'তাঁহার'।

হসন্ত—সংস্কৃতে হসন্ত শব্দগুলিতে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু বাংলা তদ্ভব শব্দে এই সমস্ত শব্দের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের চিহ্ন ব্যবহার করিয়া বানান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিষয়ে সাধারণ রীতি এই যে, বাংলায় অন্ত্য 'অ' স্বর উচ্চারিত হয় না, যেমন, 'হাত' (হাত্), 'মাঠ' (মাঠ্), 'গাছ' (গাছ্), বন-বাদার (বন্-বাদার্) ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দে হস্-চিহ্ন ব্যবহার না করিলেও উচ্চারণে কোন অসুবিধা হয় না। তবে ইহাতেও কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে।

(১) 'অ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর উচ্চারিত হয়; যেমন, যেমন 'ভাল' (ভদ্রক), 'কাল', 'কাঁদ' কাঁদ'।

(২) ণিজন্ত 'আ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর উচ্চারিত হয়; যেমন, 'কাঁদান', 'চালান', 'শোনান'।

(৩) তাহার ভাব এই অর্থে 'ম' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয়; যেমন, 'পাগলাম', নেকাম', 'পাকাম'।

(৪) 'ইত' প্রত্যয়ান্ত অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয়। যেমন, 'করিত', 'যাইত' 'খাইত'।

(৫) 'ইব' প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয়। যেমন, 'করিব', 'খাইব', 'যাইব'।

(৬) বাংলায় 'ইল' প্রত্যয়ান্ত অতীত ও প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানকালবাচক ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয়। যেমন, 'করিল', 'খাইল', গেল'।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণের পার্থক্য হেতু কথ্য ভাষায় কোথাও অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয়, কোথাও হয় না। যেমন, পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিস্বর ধ্বনিত হয় বলিয়া তৎপরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হয় এবং পুনরায় অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হয়। যেমন, 'কুম্ড়ো' (কুষ্মাণ্ড); কিন্তু

পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে শব্দের উপান্ত স্বর ধ্বনিত হয় বলিয়া অন্ত্যস্বর উচ্চারিত হইতে পারে না। যেমন, 'কুমড়্' (কুমর)। উপরে যে নিয়ম নির্দ্দেশ করা গেল তাহা কেবল সাধু-উচ্চারণ-সম্মত।

স্বরান্ত শব্দগুলিকে অন্যান্য হসন্ত শব্দ হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য বানানে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন কি না! সাধারণতঃ ইহার জন্য শব্দশেষে 'ও'কার যোগ করা হইয়া থাকে, যেমন, 'ভালো' 'পাগলামো'; কিন্তু সর্ব্বত্র এমন হয় না, যেমন, 'করিবো' 'করিলো' কখনও লেখা হয় না। কেহ কেহ আবার স্বরান্তশব্দশেষে একটি উল্টা কমা-চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেমন 'পাগলাম' '। এই সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। সেইজন্য এই সমস্ত শব্দের বানান অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলক হইয়া উঠিতেছে।

স্বরান্ত শব্দশেষে 'ও'কার যোগ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, ইহাতে অনেক সময় শব্দ প্রকৃত-অর্থভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। যেমন 'পড়া'র ভাবে 'পড় পড়' যদি 'পড়ো পড়ো' বানান করা যায় তাহা হইলে পড়িবার আদেশও বুঝাইতে পারে। তবে ক্রিয়াবাচক শব্দ ('ইত', 'ইব', 'ইল' প্রত্যয়ান্ত) ব্যতীত অন্যান্য স্বরান্ত শব্দে একটি উল্টা কমা-চিহ্নের ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, 'পাগলাম' ', 'কাল' ' (যম ও সময় বাচক শব্দ হইতে পৃথক)। ক্রিয়াপদের শব্দসংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং শব্দগুলিও সুপরিচিত বলিয়া তাহাতে আর চিহ্ন প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ—উপরে যে নিয়মের কথা বলিলাম তাহা লেখ্য বা সাধুভাষার ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেই বলিয়াছি। বাংলার আদর্শ কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদের বানানেও বড় গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি একই লেখককে বিভিন্ন প্রকার বানান পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে

দেখা যায়। যেমন, 'কর্‌বে', 'কোর্‌বে', 'কর্ব্বে', 'কোর্ব্বে' ; 'কর্‌ছে', 'কোর্‌ছে', 'কর্চ্ছে', 'কর্চ্চে', 'কোর্চ্ছে' ইত্যাদি যাহার যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই বানান করিয়া থাকেন।

এই শব্দগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহারা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া উচ্চারণানুযায়ী গঠিত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণের পার্থক্য হেতুই ইহাদের বানানেও ব্যভিচারিতা লক্ষিত হয়। তবে ইহাদের সাধু-উচ্চারণানুযায়ী বানানই গ্রাহ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাগীরথী-তীরের কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ শব্দে আদ্যস্বর ধ্বনিত করিয়া উচ্চারিত হয়। ক্রিয়াপদেরও ইহাই ধ্বনি-নিয়ম (accent system)। যেমন, 'হ'চ্চে' 'হ'ল'। এই উচ্চারণানুযায়ী বানান যদি স্থির করা যায় তাহা হইলে আদ্যবর্ণ ধ্বনিত হওয়ার জন্য তাহাতে যে 'ও'কার যোগ করা হয়, যেমন, 'কোর্‌বে', তাহাই শুদ্ধ বলিতে হয়। কিন্তু অকারান্ত আদ্যস্বর ক্রিয়াপদ ব্যতীতও ধ্বনিত হয়, অথচ তাহা 'ও'কার যোগ করিয়া লিখিবার রীতি নাই। অতএব এখানেও 'ও'কার যোগ করা বিধেয় নহে, তাহা হইলে আদ্যস্বর-ধ্বনিত অন্যান্য শব্দের সহিত ইহাদের উচ্চারণে পার্থক্য সূচিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'মন' ও 'কোর্‌বে'র আদ্যবর্ণের উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই, অতএব তাহাদের স্বতন্ত্র বানান করা সমীচীন নহে; এই ভাবে 'কোর্‌বে' ও-কার-মুক্ত হইয়া 'কর্‌বে' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ধ্বনিত করিবার জন্য শব্দের যে-স্থলে পরবর্ত্তী স্বর-ধ্বনি লুপ্ত হয় সেখানে একটি উল্টা কমা-চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে ; যেমন 'ক'রবে' (করিবে), 'হ'ল (হইল), 'পে'ল' (পাইল)। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানেরও সুবিধা হয়।

নিম্নে দুইটি ধাতুরূপ নির্দ্দেশ করা গেল :

কর্ ধাতু

কাল	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্ত্তমান	করে	কর	করি
	ক'র্ছে	ক'রচ	ক'রছি
	ক'রেছে	ক'রেছ	ক'রেছি
অতীত	ক'রল	ক'রলে	ক'রলাম
	ক'রত	ক'রতে	ক'রতাম
	ক'রছিল	ক'রছিলে	ক'রছিলাম
ভবিষ্যৎ	ক'র্বে	ক'র্বে	ক'রব
অনুজ্ঞা	করুক	কর	করি
	ক'রবে	ক'রো	

দি ধাতু

কাল	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্ত্তমান	দেয়	দাও	দি', দিই
	দিচ্ছে	দিচ্ছ	দিচ্ছি
	দিয়েছে	দিয়েছ	দিয়েছি
অতীত	দিল	দিলে	দিলাম
	দিত	দিতে	দিতাম
	দিচ্ছিল	দিচ্ছিলে	দিচ্ছিলাম
ভবিষ্যৎ	দিবে	দিবে	দিব
অনুজ্ঞা	দি'ক	দাও	দি', দিই
	দিবে	দিও	

অসমাপিকা ক্রিয়া—সাধুভাষার প্রত্যেক 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদে 'ই'র পর 'আ' থাকে ; যেমন, 'করিয়া' 'যাইয়া' 'বলিয়া'—প্রকৃত পক্ষে 'করিআ' 'যাইআ' 'বলিআ'। চলিত ভাষার উচ্চারণে এই 'ই' এবং 'আ' উভয়ে মিলিয়া 'এ' হয় এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, যেমন 'করে' (করিয়া), 'ফেলে' (ফেলিয়া), 'ডেকে' (ডাকিয়া)। এই সমস্ত শব্দের বানানকে সমোচ্চার্য্য অন্যান্য শব্দ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য লুপ্ত 'য়া' (প্রকৃত 'আ') স্থলে একটি উল্টা কমা চিহ্ন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যেমন, 'করে'' (সমাপিকা ক্রিয়া 'করে' ও হস্ত অর্থে 'কর' শব্দের ৭মী হইতে পৃথক্), 'বলে'' (সমাপিকা ক্রিয়া 'বলে' ও শক্তি অর্থে 'বল' শব্দের ৭মী হইতে পৃথক্)। অনেকে উচ্চারণানুযায়ী আদ্যস্বরে 'ও'কার যোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা এই স্থলেও প্রযোজ্য।

'বুঝা' (বুঝিতে পারা), 'শুনা' (শুনিতে পাওয়া) ইত্যাদির বানান 'বোঝা' 'শোনা' হওয়া উচিত। কারণ, ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণ নিয়মানুসারে 'আ'কারের পূর্ব্ববর্ত্তী 'উ'কার 'ও'কারে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন 'ছোরা' (কিন্তু 'ছুরি'), 'ডোরা' (কিন্তু 'ডুরি'), 'কোশাকুশি' ইত্যাদি। (পরে স্বর-সঙ্গতি দ্রষ্টব্য)।

বাংলা প্রত্যয়—বাংলার নিজস্ব কতকগুলি প্রত্যয় আছে যাহাতে অনাবশ্যক দীর্ঘস্বর, মূর্দ্ধন্য 'ণ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ইহাদেরও সর্ব্বতোভাবে বাংলা উচ্চারণানুযায়ী হ্রস্ব স্বর, বর্গীয় 'জ' ও দন্ত্য 'ন' দিয়া* বানান হওয়া উচিত। যেমন, 'পনা' (গিন্নীপনা), 'আনি' 'উনি' (ঠেঙ্গানি, জলুনি)। 'তি' (চুনাতি), 'টি' (একটি), 'ড়ি' (জুয়াড়ি), 'কি' (ছোটকি), 'ই' (ইংরেজি, ফরাসি, পারসি, আরবি),

'আমি' (পাগ্‌লামি), 'আরি' (ডুবারি), 'আনি' (নাকানি চুবানি) ইত্যাদি। স্ত্রী-বাচক প্রত্যয়গুলি সংস্কৃতের অনুযায়ী দীর্ঘ ঈ যুক্ত হওয়াই উচিত। যেমন, 'ডুম্‌নী', 'বুড়ী'।

দেশজ শব্দ

আর্য্য ভাষা বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার কতকগুলি শব্দ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাংলায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাদিগকে মূলতঃ দ্রাবিড়, তিব্বত-চৈনিক কিম্বা বাংলা-দেশের অন্য কোন আদিম অধিবাসীর ভাষা হইতে উচ্চারণে বিকৃত কিম্বা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই জাতীয় শব্দকেই দেশজ শব্দ বলা হয়। যেমন, 'হাড়ি', 'ডোম', 'ডালা', 'কুলা', 'ডাঙ্গা', 'ডিঙ্গি', 'কান্দা' ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দের সংস্কৃত হইতে উদ্ভবের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়াই ইহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রকার অনুমান করা হইয়া থাকে। সংস্কৃতের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া ইহাদের বানান গঠনে ব্যুৎপত্তির নির্দ্দেশ মানিবার উপায় নাই।

এই দেশে আর্য্যভাষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় শব্দও দ্রুত সংস্কৃতের মত বাহ্য আকৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিল। সেইজন্য অদ্যাবধি অবিকৃত দেশজ শব্দের সংখ্যা বাংলা ভাষায় খুব অধিক নহে। কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য গৃহস্থালি দ্রব্যের নামবাচক এই জাতীয় শব্দ এখনও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন, 'ঘর' (সংস্কৃত 'গৃহ'র সহিত কোন সম্পর্ক নাই; বাংলা 'ঘের্' ধাতু,—ঘেরা, বেষ্টন করা হইতে জাত), 'ঘাট', 'কোল', 'কোয়া', 'খড়', 'খদি', 'খৈল', 'খড়ম', 'খন্দ', 'খাড়া', 'খাম্বা', 'খিলি', 'খোঁড়ল', 'টিপ', 'টুক্‌রি', 'টোপর' ইত্যাদি। বাংলার কতকগুলি প্রাচীন গ্রামের নামের মধ্যেও এই প্রকার কতক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন, 'উখ্‌ড়া', 'ইগোবা', 'অণ্ডাল', 'আসানসোল', 'ছাতনা', 'নান্নুর', 'কেন্দুলি', 'কাজোরা', 'দামড়া', 'শিউড়ি', 'সাঁইথিয়া',

'কাটোয়া', 'কালনা', 'কাঁথী', 'হুগলী', 'হাওড়া', 'ঢাকা' ইত্যাদি। বাংলার কতকগুলি লৌকিক দেবদেবীর নামেও দুই একটি এইপ্রকার শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন, 'মনসা' (দ্রাবিড় দেবী 'মঞ্চা'), 'গারসী', 'ঘাটু' ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত খাঁটি দেশজ শব্দও সংস্কৃতের প্রভাবে পড়িয়া নূতন কলেবর লাভ করিতেছে। যেমন, 'গাল' হইতে 'গল্ল' বা 'গণ্ড', 'মোনাপাড়া' হইতে 'মোহনপল্লী', 'মঞ্চা' হইতে দেবী 'মনসা'।

এই জাতীয় দেশজ শব্দগুলিকে সংস্কৃতের মর্য্যাদা দিবার বাতিক বর্ত্তমানকালে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় সমস্ত শব্দকেই সংস্কৃতের পোষাক পরাইয়া গ্রহণ করা যেমন সম্ভবও নহে তেমনি অনাবশ্যক। অতএব ইহাদের জন্যও একটি নির্দ্দিষ্ট বানানের রীতি অবলম্বন করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত শব্দ সাধারণতঃ উচ্চারণানুযায়ীই গঠিত হয়। যে শব্দগুলি বাংলার যে অঞ্চলে উদ্ভূত এবং অধিক ব্যবহৃত সেইগুলি সেই অঞ্চলেরই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য যে সমস্ত শব্দ চন্দ্রবিন্দু এবং 'ড়' যুক্ত তাহারা রাঢ়দেশে এবং চন্দ্রবিন্দু ও 'ড়' বর্জ্জিত 'র'যুক্ত শব্দগুলি সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গেই উদ্ভূত ও অধিক ব্যবহৃত হয়। বাংলা উচ্চারণ ও ব্যবহারানুযায়ী এই সমস্ত শব্দে প্রয়োজনীয় স্থলে সর্ব্বত্রই হ্রস্ব স্বর ('ই', 'উ'কার), বর্গীয় 'জ', দন্ত্য 'ন' (ণত্বের বিধি-অনুযায়ী যেখানে মূর্দ্ধন্য হইবে সেখানে মূর্দ্ধন্য 'ণ') ও দন্ত্য 'স' (ষত্ব স্থলে মূর্দ্ধন্য 'ষ' ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অতএব 'শিউড়ি', 'হুগলি' বানান হওয়াই উচিত।

দেশজ শব্দের বানানে ব্যাপক 'ড়'র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জাতীয় শব্দ সাধারণতঃ রাঢ় দেশেই অধিক

প্রচলিত, সেইজন্যই সাধু প্রয়োগ বলিয়া গ্রাহ্য। যেমন, ‘চিংড়ি’, ‘চঁচাড়ি’ ‘ছাড়া’ ‘ছুঁড়ি’, ‘ছোঁড়া’ (কিন্তু ‘ছোরা’ চাকু অর্থে সংস্কৃত ‘ক্ষুরিকা’ হইতে জাত বলিয়া ‘র’) ‘জড়’, ‘ঝাড়’, ‘ঝাড়ন’ ‘ঝাঁকড়া’ ইত্যাদি।

ধ্বনিজ শব্দ

বিবিধ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ করিয়া ভাষায় যে সমস্ত শব্দ গঠিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে ধ্বনিজ শব্দ (onomatopoeia) বলা যায়। যেমন, 'ঢাক', 'ডাহুক', 'ঝন্‌ঝন্', 'চেঁচান' ইত্যাদি। প্রত্যেক ভাষাতেই এই জাতীয় শব্দসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। প্রত্যেক জাতিরই বিশিষ্ট উচ্চারণানুযায়ী এই শ্রেণীর শব্দ গঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদিগকে দেশি শব্দ বলা যায়।

বিশেষ্য বিশেষণ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ পদেই এই সমস্ত শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন,

বিশেষ্য—(বস্তুবাচক) 'ঢাক', 'ঢোল', 'ঝাঁঝ', 'কাড়া', 'নাকাড়া', 'টিকারা', 'ভেঁপু', 'ফট্‌ফটি' ইত্যাদি।

(প্রাণিবাচক) 'কাক', 'ডাহুক', 'ধুতুম', 'খেঁকশিয়ালি', 'টিকটিকি', 'ঘুঘু', 'ঝিঁঝি', 'ভোম্‌রা' ইত্যাদি।

বিশেষণ—'লিক্‌লিকে', 'চক্‌চকে', 'টক্‌টকে', 'চট্‌পটে', 'স্যাঁৎ-স্যাতে', 'চিট্‌চিটে', 'ঝাপ্‌সা', 'চট্‌কা', 'ফচ্‌কে', 'খেঁকি', ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বিশেষণ—'ঝন্‌ঝন্', 'ভনভন্', 'শন্‌শন্', 'টাপুর টুপুর', 'টুপ্‌টাপ', 'ঠুক্', 'ঠন্', 'টক্', 'ঝক্', 'শোঁ'।

ক্রিয়া—'মট্‌কান', 'ভেঙ্‌চান', 'খ্যাংলান', 'টাটান', 'টংকরানি', 'ফর্‌ফরানি', 'ঢিপান', 'ঢালান', 'চেঁচান', 'খেঁকান', 'খোঁচান'।

এই জাতীয় শব্দের বানান সাধারণতঃ উচ্চারণানুযায়ী হইয়া থাকে। অতএব ইহাদের অনাবশ্যক দীর্ঘস্বর, 'ণ', 'ষ', 'শ', 'য' ইত্যাদি বর্জ্জনীয়।

বাংলায় হস্-চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম না থাকিলেও এই জাতীয় শব্দে সর্ব্বদা হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তদ্ভব শব্দে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের যে বিধি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের সেই রীতিই অবলম্বন করা যাইতে পারে।

বিদেশি শব্দ

বাংলায় ব্যবহৃত যে সমস্ত শব্দ ভারতের বাহিরের কোন ভাষা হইতে আসিয়াছে তাহাদিগকে বিদেশি শব্দ বলা যায়। আরবি, পারসি, তুর্কি, পোর্ত্তুগীজ, ইংরেজি, ফরাসি ও চীনদেশীয় দুই একটি শব্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

খ্রিষ্ট চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক পুঁথিতে সর্ব্বপ্রথম আরবি ও পারসি কয়েকটি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। ইহাই বঙ্গভাষায় বিদেশি শব্দ ব্যবহারের সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন। যেমন, 'বাকী', 'খন্ধ', 'কামাণ', 'মজুরিআ'। এই সমস্ত শব্দের বানান তৎকালে প্রচলিত বাংলা বানানের রীতি অনুযায়ীই লিখিত হইয়াছে।

খ্রিষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতেই তাঁহারা বাংলার সামাজিক জীবনের উপরও নানা দিক দিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে লিখিত পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক বিরাট পুঁথিতে মাত্র চারিটি, আরবি ও পারসি শব্দের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, প্রথম অবস্থায় বাংলা ভাষায় মুসলমান-প্রভাব অত্যন্ত দ্রুত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রিষ্ট ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই হুসেন সাহ্ প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গদেশের বিদ্যোৎসাহী পাঠান নবাবের আনুকূল্যে বঙ্গ ভাষার ব্যাপক চর্চ্চা যেমন আরম্ভ হইল তেমনি মুসলমান নবাব কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট বাংলা ভাষায় আরবি ও পারসি শব্দের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় হইতেই এই প্রকার কতকগুলি শব্দ বাংলায় আসিয়া প্রবেশ করিল। যেমন, (আরবি ও পারসি) 'আবাদ',

'আবীর', 'কম', 'কলম', কাগজ', 'কেরদানি', 'কিনারা', 'কোমর', 'খুশী', 'চশ্‌মা', 'চাকর', 'চালাক', 'জামা', 'জায়গা', 'জমী', 'তখ্‌তপোশ', 'তৈয়ার', 'তোশক', (তোষক নহে, কারণ, সংস্কৃত 'তুষ্‌' ধাতুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই), 'দরকার', 'দরখাস্ত', 'দরদি', 'দলীল' 'দাগ', 'দেরী', 'পরদা', 'পল্‌তে', 'পোশাক' ('পোষাক' নহে, কারণ, সংস্কৃত 'পোষ্‌' ধাতুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই), 'বাতাস', 'বিলাত', 'ময়দা', 'মাল', 'রওনা', 'লাল', 'শহর', 'সাদা', 'সব্জি', 'হিন্দু', 'হাওয়া', ইত্যাদি। (তুর্কি)—'চাকু', 'চিক্‌', 'তোপ', 'বন্দুক', 'বারুদ', 'আলোয়ান', ইত্যাদি।

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজ নাবিক কর্ত্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতের জলপথ আবিষ্কৃত হইবার অত্যল্পকালমধ্যেই পোর্ত্তুগীজ বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন। খ্রিষ্ট ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলা দেশের ঢাকা (ফিরিঙ্গি বাজার) ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পোর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়।

ইউরোপের জীবনযাপনপ্রণালী বাংলা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেইজন্য আগন্তুকদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য আসবাবপত্রের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাংলা ভাষায় আর কোন প্রতিশব্দ ছিল না। সেইজন্য এই প্রকার কতকগুলি শব্দ বিদেশীয় আকৃতিতেই বাংলায় সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ-লাভ করিল। যেমন, 'গির্জ্জা', 'পাদ্‌রি', 'জানালা', 'বারান্দা', 'কেদারা', 'বাল্‌তি', 'বোমা', 'পিস্তল', ইত্যাদি।

পোর্ত্তুগীজদিগের পথানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিও ক্রমে ক্রমে ভারতের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা দেশের চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কুঠি নির্ম্মিত হয়;

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আসিয়া হুগ্‌লিতে এবং সর্ব্বশেষে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা আসিয়া চন্দননগরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে ওলন্দাজগণ ইংরেজদিগের নিকট তাহাদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি বিক্রয় করিয়া ভারতের উপকূল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফরাসিরাও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজদিগের নিকট পরাজিত হইলেন; অতঃপর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজেরাই বাংলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন।

ওলন্দাজগণ এদেশে অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিলেন বলিয়া বাংলা ভাষায় তাঁহাদের কোন নিজস্ব শব্দ প্রবেশ করিতে পারে নাই; ফরাসিগণও অল্পকাল মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য কর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কয়েকটি শব্দমাত্র বাংলায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর বিভিন্নমুখী জীবনের মধ্যে ইংরেজির প্রভাব বহুদিক দিয়াই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবেই বহু ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়া এখনও নিত্য স্থান লাভ করিতেছে। বাংলার বিশিষ্ট উচ্চারণদ্বারা এই জাতীয় শব্দ সমস্তই প্রায় অল্পবিস্তর মার্জ্জিত হইয়াছে; যেমন, 'আরদালি', 'ইস্কুল', 'কাপ্তেন', 'ডাক্তার', 'শাস্ত্রী', 'কেম্বিস', 'গারদ' (guard), 'তেরজুরি' (Treasury), 'সিলেট', 'টেবিল', 'মেম', 'বাণ্ডিল', 'কানেস্তার' (canister) ইত্যাদি।

এই জাতীয় শব্দের বানানে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করা হয় না। ইহা সাধারণতঃ ইহাদের নিজস্ব-উচ্চারণানুযায়ীই গঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালি জনসাধারণ আরবি-পারসি ও ইংরেজি-ফরাসি উচ্চারণের মূল প্রকৃতিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া সকল ক্ষেত্রে তাহারা ঐ সকল বিদেশি শব্দের নির্ভুল উচ্চারণেও সমর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত এই

সমস্ত বিদেশি ভাষার শব্দ যথাযথ লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য বাংলায় অনুরূপ অনেক বর্ণেরও অভাব। সেইজন্য বিশেষ কোন প্রচলিত নিয়মের অভাবে ইহাদের বানান চরম স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম গঠন সম্ভব কি না তাহাই এই অংশে আলোচনা করা যাইবে।

আরবি-পারসি

পারসি ভাষার মধ্য দিয়া পারসি উচ্চারণানুযায়ী মার্জ্জিত হইয়া আরবি ও তুর্কি শব্দ বাংলায় আসিয়াছে। অতএব বাংলায় ব্যবহৃত পারসি শব্দ সম্বন্ধে যদি কোন নিয়ম অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে তাহা আরবি ও তুর্কি শব্দের উপরও প্রয়োগ করা যাইবে।

পারসি বর্ণমালায় মোট বত্রিশটি অক্ষর; বত্রিশটিকেই ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া ধরা হয়, পারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ নাই। 'জাবর' (َ) 'জের্' (ِ) 'পেশ্' (ُ) নামক তিনটি চিহ্নদ্বারা যথাক্রমে 'আ' 'ই' ও 'উ' র স্বর উচ্চারণ সূচিত হয়। তবে এই বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রায় স্বরধ্বনি সূচক বর্ণও আছে,—যথা 'আলিফ্' (ا) 'ইয়ে' (ي) 'ওয়াও' (و); ইহারা সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তঃস্থ বর্ণের অনুরূপ উচ্চারিত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্বর-চিহ্ন যুক্ত হইলে ইহারা দীর্ঘ স্বরোচ্চারণ নির্দ্দেশ করে, এতদ্ব্যতীত পারসিতে দীর্ঘস্বর সূচক আর কোন বর্ণ নাই।

বাংলার ব্যঞ্জনান্তর্গত মহাপ্রাণ বর্ণগুলির পারসিতে স্পর্শ-উচ্চারণ (stop) হয় না। অর্থাৎ বাংলায় 'খ' 'ঘ' 'ছ' 'ঝ' 'ঠ' 'ঢ' 'ফ' 'ভ' ইত্যাদি যেমন উচ্চারিত হয়, পারসিতে তেমন হয় না। এই বর্ণগুলির বাংলা উচ্চারণে জিহ্বা তালু

স্পর্শ করে কিন্তু পারসিতে তালু স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়।

বাংলায় দন্ত্য ন ও মূর্দ্ধন্য 'ণ' আছে কিন্তু পারসিতে একটি 'ন' এবং তাহা দন্ত্য উচ্চারণ-সূচক।

বাংলা বর্ণমালায় তিনটি উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স) গৃহীত হইয়াছে কিন্তু পারসিতে মূর্দ্ধন্য 'ষ' র উচ্চারণ নাই—কেবল দন্ত্য ও তালব্য 'শ'রই উচ্চারণ আছে।

পারসিতে ইংরেজি zএর অনুরূপ উচ্চারণ-সূচক ব্যঞ্জন বর্ণ আছে, কিন্তু বাংলায় নাই।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, পারসি বর্ণ মালার উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাংলায় বানান গঠন করা সম্ভব নহে, কারণ পারসি ও বাংলা বর্ণমালা এক নহে। এ'যাবৎ পারসি শব্দের বাংলায় যে বানানের রীতি প্রচলিত আছে তাহা দ্বারা মূল শব্দের নির্ভুল উচ্চারণ হয় না।

পারসির যে সমস্ত বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় নাই আমরা তাহাদেরও চেষ্টা করিলে উচ্চারণ করিতে পারি। এই অবস্থায় নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিয়া বাংলায় প্রচলিত পারসি শব্দগুলিতে যথাযথ উচ্চারণানুযায়ী বানান করা কর্ত্তব্য কিনা তাহা বিবেচ্য।

এই সম্বন্ধে হিন্দিতে যে রীতি গৃহীত হইয়াছে কেহ কেহ বাংলাতেও তাহা গ্রহণের পক্ষপাতী। হিন্দিতে উপরি উক্ত

মহাপ্রাণ বর্ণগুলির নিম্নে একটি বিন্দু বা রেখাচিহ্ন ব্যবহার করিয়া পারসি উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, 'খিলাফ' (**খ়িলাফ়**) 'জমীন' (**জ়মীন**) ইত্যাদি।

হিন্দির রীতি বাংলায় অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। পারসির সহিত হিন্দির যেই সম্পর্ক বাংলার সেই সম্পর্ক নহে। হিন্দি, উর্দ্দু দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত। এই উর্দ্দুর মধ্য দিয়া যে পরিমাণ পারসি শব্দ হিন্দিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং নিত্য করিতেছে, সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাংলাভাষায় তাহার শতাংশের একাংশও প্রবেশ করিতে পারে নাই। অতএব হিন্দিভাষা পারসি শব্দের বানান সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে বাংলায় তাহা গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলা বর্ণমালা এঁকেই যে পরিমাণে জটিল, ইহার উপর আবার নূতন বর্ণসৃষ্টি কদাচ সমীচীনও নহে। অতএব বাংলায় প্রচলিত বর্ণমালা দিয়াই আরবি-পারসি শব্দেরও বানান গঠন করিতে হইবে ; ইহাতে মূলশব্দের যথাযথ উচ্চারণ হইবেনা সত্য, কিন্তু যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণে আমরা নিত্য অভ্যস্ত নহি নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই যে আমরা সেই বিদেশীয় বর্ণগুলির যথাযথ উচ্চারণ করিতে থাকিব তাহাও সত্য নহে। কারণ, জাতীয় নিজস্ব উচ্চারণের প্রবৃত্তি কিছুতেই দূর হইতে পারেনা। যেমন, হিন্দিতে ব্যবহৃত পারসি শব্দ 'কাগজ' সর্ব্বদাই 'কাগদ'

(কাগজ্) উচ্চারিত হয়। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে।

বাংলায় সাধারণতঃ এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিলেই আরবি পারসি শব্দগুলির যথাসম্ভব উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। যেমন,—

(১) 'জের' (ِ) 'জাবর' (َ) ও 'পেশ্' (ُ) চিহ্নিত বর্ণ বাংলায় যথাক্রমে 'ই' 'আ' ও 'উ' স্বর যুক্ত হইবে। যেমন, 'বিলি' (بلی) 'মুঘল' (مغل) 'আকল' (عقل)।

(২) 'য়ে' (ی) 'ওয়াও' (و) 'জের্'কিম্বা 'পেশ' যে কোন স্বরচিহ্ন যুক্ত হইলে দীর্ঘ হইবে। যেমন 'বীমা' (بیما) 'কাজী' (قازي) 'ঈদ' (عید) 'উদ্' (اود)।

(৩) 'সাদ' (ص) 'সিন্' (س) 'সে' (ث) বর্ণগুলি বাংলার দন্ত্য স দিয়া লিখা হইবে, যেমন, 'আসল' (اصل) আস্মান্ (آسمان)।

এবং 'শিন্' (ش) তালব্য শ দিয়া লিখা হইবে। যেমন, 'খুশী' (خوشی) তক্তপোশ (تختپوش) তোশক (توشک) 'পোশাক' (پوشاک) 'শরবৎ' (شربت)।

বাংলায় ব্যবহৃত পারসি শব্দে মূর্দ্ধন্য 'ষ' ব্যবহৃত হইবে না। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের অত্যন্ত অসুবিধা হয়; কারণ, অনেক শব্দ এইভাবে সংস্কৃত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(৪) 'জিম্' (ج Eng J) 'জো' (ظ Eng Z) জ্বাদ্ (ض) 'জ্বে' (ژ) 'জে' (ز) ইত্যাদি সমস্ত বর্ণই বাংলা

বর্গীয় জ দিয়া লিখা হইবে। যেমন, 'জমী' (زمین) 'জবাব' (جواب) 'জহর' (زهر) 'হুজুর' (حضور)।

(৫) নুন্ (ن) বর্ণটিকে সর্ব্বদাই বাংলার দন্ত্য ন দিয়া বানান করিতে হইবে ; যেমন, 'কোরান' (قران) 'মুসলমান' (مسلمان)। এই প্রকার শব্দে মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহার করা উচিত নহে।

(৬) 'খে' (خ) 'ঘৈন্' (غ) ইত্যাদি বাংলার মহাপ্রাণ বর্ণানুযায়ী 'খ' 'ঘ' দ্বারা লিখা উচিত, যেমন, 'তুঘলক্' (طغلق) 'মুঘল' (مغل) 'খুশী' (خوشی) ; 'সে' (ث) কে কদাচ 'ছ' দিয়া বানান করা কর্ত্তব্য নহে।

ইউরোপীয়

এই দেশ হইতে পোর্ত্তুগীজ প্রাধান্য লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় পোর্ত্তুগীজ শব্দ প্রবেশও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে অল্প সংখ্যক শব্দ ইতিপূর্ব্বেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাও বাংলা উচ্চারণানুযায়ী মার্জ্জিত হইয়া নিজেদের বানানও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। ফরাসি শব্দগুলি ইংরেজির মধ্যদিয়াই আসিয়াছিল। অতএব, ইংরেজির নিয়মই ফরাসিরও নিয়ম।

ইংরেজিতে পাঁচটি স্বর ও একুশটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। এই স্বরবর্ণ গুলির উচ্চারণ সর্ব্বত্র এক নহে। এমন কি অনেকগুলি ব্যঞ্জনেরও উচ্চারণে স্থিরতা নাই; যেমন,

A—অ, আ, এ্যা, এ

E—ই, এ, এ্যা, আ

I—ই, আ

O—ও, ঔ, আ, অ

U—ই, আ, উ

C—ক, চ

G—গ, জ

H—হ, অ ইত্যাদি।

Ch—চ, ছ, ক, খ,

আবার কোন কোন শব্দে কতকগুলি বর্ণ লিখিত হইয়াও উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'Knight' (নাইট্) 'Pslam' (সাম্) ;—ইহাতে একাধিক বর্ণ উচ্চারণতঃ অনাবশ্যক।

ইংরেজির কতকগুলি বর্ণ বাংলায় নাই। যেমন; 'f', 'r', 'w', 'z'। ইহাদের উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন হয় না, কিম্বা জিহ্বা তালু স্পর্শ করে না। ইংরেজিতে দীর্ঘস্বর নাই তবে শব্দমধ্যে দুইটী স্বর পর পর ব্যবহৃত হইয়া দীর্ঘ উচ্চারিত হয়; যেমন, wool (উল) seal (সীল)।

স্বর-ধ্বনি—প্রত্যেক ইংরেজি স্বরবর্ণের স্বতন্ত্র ধ্বনি অনুযায়ীই বাংলায় ইংরেজি শব্দের বানান হওয়া কর্ত্তব্য। যেমন, 'অ' ('কল' call), 'আ' ('পার্ট part) 'এ্যা' (ম্যালেরিয়া—Malaria) 'এ' ('কেস্—case)। ইংরেজি শব্দে যেখানে যুগ্ম-স্বর (Dipthong) বা পর পর একাধিক একই বা স্বতন্ত্র স্বর ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে বাংলায়ও দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হওয়া উচিত। যেমন, 'সীজার', (Caeser) 'বীট', (Beet) 'ঈগল', (Eagle) 'নিউ জীল্যাণ্ড্' (New Zealand)। অন্যত্র ইংরেজি শব্দের বানানে কদাচ দীর্ঘস্বর ব্যবহার্য্য নহে।

ব্যঞ্জন—ইংরেজি 'f' 'v' 'w' 'z' বাংলায় যথাক্রমে 'ফ' 'ভ' 'ওয়' 'জ' বানান হওয়াই উচিত। কেহ কেহ একমাত্র 'z' টির উচ্চারণ নিষ্ঠা রক্ষা করিতে গিয়া হিন্দির অনুরূপ 'জ'র নীচে একটি বিন্দু বা রেখাচিহ্ন যোগ করিয়া লইতে চাহেন। কিন্তু অন্যান্য বর্ণগুলিকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র z এর জন্য বাংলায় নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিয়া লইলে সহসা এই মনে হইতে পারে যে, একমাত্র zই বুঝি বাংলা বানানে লিখা অসুবিধাজনক ছিল। অতএব, নিয়ম করিতে হইলে সমস্তগুলি বর্ণের জন্যই নিয়ম করিতে হয়। হিন্দিও তাহাই করিয়াছে কিন্তু বাংলায় তাহা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি অনাবশ্যক। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অতএব একমাত্র z টিকেই স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিবার কোন কারণ নাই।

ইংরেজি 'sh' উচ্চারণের জন্য 'শ' ও 's'র জন্য দন্ত্য স ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে।

বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে যুক্তাক্ষরের মধ্যে একটি মূর্দ্ধন্য বর্ণ হইলেও অপরটি মূর্দ্ধন্য বর্ণ হয়। যেমন, 'কষ্ট', 'স্পষ্ট', 'ইষ্ট'। ইংরেজি শব্দের বাংলা বানানেও এই নিয়মই গ্রহণ করা উচিত। কারণ, ইহাই উচ্চারণ বিজ্ঞান-সম্মত। পূর্ব্বে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

ঋ ফলা, র ফলা—বিদেশি শব্দের ঋ-ফলা দিয়া বানান না করাই কর্ত্তব্য। কারণ, যদিও সংস্কৃত শব্দের বানানের জন্য 'ঋ' কে আমাদের স্বর বর্ণ মধ্যে রক্ষা করিতে হইতেছে তথাপি আমাদের নিজস্ব উচ্চারণে আমরা কদাচ 'ঋ' র উচ্চারণ করিনা। 'ঋ'র স্থলে অন্তঃস্থ বর্ণ 'র'ই উচ্চারণ করি। অতএব বিদেশি শব্দের বেলায় আর 'ঋ' ফলার নিরর্থক বিড়ম্বনা কেন? তৎপরিবর্ত্তে র-ফলা ব্যবহার করিলেই চলে। কারণ, বাংলা উচ্চারণতঃ ইহাই শুদ্ধ। অতএব 'খ্রিষ্টান' 'খ্রিষ্ট' 'খ্রিষ্টাব্দ' লিখাই উচিত।

অন্যান্য

আরবি পারসি ও ইউরোপীয় শব্দ ব্যতীত বাংলায় কয়েকটি চীনা এবং ব্রহ্মদেশীয় শব্দও প্রচলিত আছে। যেমন, 'চিনি', 'চা' 'ডেঙ্গু' 'সুরঙ্গ' 'লুঙ্গি'—ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং ইহাদের বানানও ইতিমধ্যে স্থির হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক শব্দ

ইহাদের প্রকৃতপক্ষে বিদেশি শব্দ বলা যায় না। কারণ, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা ব্যতীত উত্তর ভারতের সমগ্র ভাষাই বাংলার মত আর্য্য ভাষা সম্ভূত। দ্রাবিড় ভাষা মূলতঃ বাংলার পক্ষে বিদেশি হইলেও ইহা হইতে আগত শব্দগুলি অত্যন্ত প্রাচীন; এমন কি অনেকগুলি সংস্কৃতের মধ্য দিয়াই বাংলায়ও আসিয়াছে। যেমন, 'মলয়', 'মীন', 'কম্বল'। ইহাদের বানান এই জন্যই সমস্যামূলক নহে।

কয়েক বৎসর যাবৎ রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও অন্যান্য কারণে বাংলার সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নানাবিধ ভাবের আদান প্রদান আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কতকগুলি হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি শব্দ ইতিমধ্যেই বাংলায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। যেমন, 'হরতাল', 'হরিজন', 'দাঙ্গা', 'আটক', 'আড্ডা', 'খেলোয়াড়', 'হল্লা', 'ভীড়', 'চিঠি', 'ডাণ্ডা', 'ওড়না', 'ঝরনা', 'ইন্দারা', 'পছন্দ', 'ঠিকানা', 'ঠাট্টা', 'হোলি', 'কয়লা', 'ভাড়া', 'মিঠাইওয়ালা' ইত্যাদি।

যেহেতু বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য-ভাষাভাষীদিগের বর্ণমালা স্বতন্ত্র নহে সেইজন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত বানানের অনুরূপ বাংলায়ও এই জাতীয় শব্দের বানান গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য তাহা হইতেই প্রত্যেক শব্দের নিজস্ব প্রাদেশিক উচ্চারণ সম্ভব হইবে না; তথাপি বানানের একতা রক্ষিত হইবে। ইউরোপের ভাষাসমূহ তাহাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দাবলীর বানান সম্বন্ধেও এই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে।

———

শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি

বাংলা সাধুভাষার শব্দের প্রকৃতি ও তাহার উপর নির্ভর করিয়া বানান গঠনের উপায় সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু ইহা সত্য যে, চলিত ভাষাকে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। ইহার নিজস্ব গতি-পথে ইহা চলিতে বাধ্য। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। এই সমস্ত ব্যতিক্রমকে একটু উদার দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহাদিগের মধ্যেও কোন নিয়মের সন্ধান করিতে হইবে। কারণ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, ভাষা কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়াই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে যদি কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয় একটু অনুসন্ধান করিলে তাহাতেও সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখন এই প্রকার কতকগুলি ব্যতিক্রমের মধ্যে ভাষাতত্ত্বানুমোদিত কারণ নির্দ্দেশ করিব।

ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত শব্দও উচ্চারণ-ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী কালে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বানানও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারও কতকগুলি উচ্চারণগত নিয়ম আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণকর্ত্তৃক গৃহীত এই প্রকার কয়েকটি নিয়ম এখানে উল্লেখ করিব।

(১) সমীকরণ—(Assimilation) উচ্চারণ সৌকর্য্যের নিমিত্ত শব্দমধ্যস্থ বিভিন্ন বর্ণ একই বর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়ার নাম সমীকরণ। যেমন, 'এ্যাদ্দিন' (এতদিন) 'গপ্প' (গল্প) 'ক'ত্তাম্' (কর্‌তাম)

(২) বিষমীকরণ—(Dissimilation) একই স্বরের পর পর উচ্চারণজাত একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য শব্দমধ্যস্থ যে এক স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তে অন্য স্বরধ্বনির আগম হয় তাহাকে বিষমীকরণ কহে। যেমন, 'জানেলা' (জানালা) 'অজাগর' (অজগর) 'নেউর' (নূপুর)

(৩) স্বর-ভুক্তি—(Epenthesis) শব্দমধ্যস্থ স্বরোচ্চারণকে দীর্ঘ করিবার জন্য 'ই' ও 'উ'র আগমকে স্বর-ভুক্তি কহে। যেমন, 'আইসে' (আসে) 'হউন' (হ'ন) 'গাঁইট' (গাঁট); ইহা পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণের একটি বৈশিষ্ট্য

(৪) স্বরাগম—(Prothesis) যদি শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকে তবে উচ্চারণের স্থবিধার জন্য উক্ত যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে যে কখনও কখনও 'ই' বা 'উ' স্বরের উৎপত্তি হয় তাহাকে স্বরাগম কহে; যেমন, 'আস্পর্দ্ধা' (স্পর্দ্ধা) 'আঘ্রাণ' (ঘ্রাণ) 'ইস্কুল' (স্কুল)

(৫) বর্ণ-বিপর্য্যয়—(Metathesis) উচ্চারণে অসাবধানতা বশতঃ কোন শব্দের দুইটি বর্ণ যদি পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চারিত হয় তাহা হইলে তাহাকে বর্ণবিপর্যায় কহে। যেমন, 'ফাল' (লাফ) 'বাস্ক' (বাক্স) 'বানারসী' (বারাণসী)

(৬) মহীকরণ—(Aspiration) শব্দমধ্যস্থ কোন অল্পপ্রাণ বর্ণকে ধ্বনিত করিয়া মহাপ্রাণ ও স্বরবর্ণকে 'হ'তে পরিণত করার নাম মহীকরণ। যেমন, 'ভুত' (পারসি, 'বুত') 'ফরাসি' (পারসি) 'শালিখ' (সারিকা)

(৭) অল্পীকরণ—(De-aspiration)—শব্দমধ্যস্থ মহাপ্রাণ বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ধ্বনিত হইলে উক্ত মহাপ্রাণ বর্ণ যে অল্প প্রাণে

পরিণত হইয়া যায় তাহাকে অল্পীকরণ কহে। যেমন, 'পাতর' (পাথর) 'দিচ্চে' (দিচ্ছে) 'আবাগী' (অভাগী)

(৮) বর্ণ-দ্বৈতি—(Doubling of consonants) শব্দমধ্যস্থ কোন কোন স্বর ধ্বনিত হইলে তদাশ্রিত ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়, তাহাকে বর্ণ-দ্বৈতি বলে। যেমন, 'এক্কেবারে' (একেবারে) 'সক্কাল' (সকাল) 'ঠোক্কর' (ঠোকর)

(৯) বর্ণনাশ—(Haplology) একই বর্ণের পর পর উচ্চারণ হইলে তন্মধ্যস্থ একটি বর্ণ যে কখনও কখনও লুপ্ত হইয়া যায় তাহাকে বর্ণনাশ কহে। যেমন, 'কা' (কাকা) দা' (দাদা) দি' (দিদি)

(১০) স্বর-সঙ্গতি—(Vowel Harmony) শব্দমধ্যস্থ কোন বর্ণের স্বর-ধ্বনি দ্বারা অন্য কোন বর্ণের কোন স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি প্রভাবান্বিত হওয়াকে স্বর-সঙ্গতি বলে। যেমন, 'জেতে' (জাতে) 'দুপুর' (দু'পর) 'দিব্যি' (দিব্য) 'বিনি' (বিনা)

এই স্বর-সঙ্গতির বিশেষ কতকগুলি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যেমন;

(ক) শব্দমধ্যস্থ অ-কারের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ই' বা 'ঈ' এ-কারে পরিণত হয়। যেমন, 'ভেতর' (ভিতর)

(খ) আ-কারের পূর্ব্ববর্ত্তী 'উ' কার 'ও' কারে পরিণত হয়। যেমন, 'ছোরা' (ছুরি হইতে) 'ঝোলা' (ঝুলি হইতে)

(গ) 'ই' বা 'ঈ' র পূর্ব্ববর্ত্তী 'ও' কার 'উ' কারে পরিণত হয়। যেমন, কুণি, (কোণ হইতে) চালুনি (চাল্‌নি) কুশী (ছোট কোশা)

বানানে আর্ষ প্রয়োগ

বাংলা ভাষার প্রাচীন লেখকেরা তাঁহাদের সমসাময়িক রীতি অবলম্বন করিয়া শব্দের বানান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে বানান সম্বন্ধে নূতন নিয়ম করিয়া এই অনুযায়ী তাঁহাদের শব্দকেও সংস্কার করিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ইংরেজি সাহিত্যে চসার, সেক্সপীর, মিলটন্ প্রভৃতির এমন অনেক বানান আছে যাহা আধুনিক ভাষায় অপ্রচলিত। ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণে তাহা আর্ষ প্রয়োগ (archaic form) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বাংলায়ও প্রাচীন লেখক-দিগের বানানের উপর যাহাতে হস্তক্ষেপ করা না হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহা আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া ব্যাকরণে স্থান পাওয়া উচিত। ইহাতে প্রাচীন বানানের একটি রীতি জানিতে পারা যায় বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহার মূল্য অপরিসীম।

কথ্য ভাষার শব্দ

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে সাধু ভাষার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা গেল। কিন্তু এই সাধুভাষা যাহা হইতে রূপ পরিগ্রহ করিয়া রসপুষ্ট হইতেছে তাহাই কথ্য ভাষা। চলিত ভাষার ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব কথ্য ভাষাগুলির স্থানও অপরিসীম।* প্রকৃতপক্ষে কথ্য ভাষাই জীবিত ভাষার প্রাণ স্বরূপ; যে ভাষার কথ্যভাষা বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাকেই মৃত ভাষা বলা হয়, যেমন, সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি। কথ্যভাষার অস্তিত্ব দিয়াই ভাষার জীবন নিরূপিত হইয়া থাকে। অতএব কোন জীবিত ভাষার প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে ইহার কথ্যভাষাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধেও যথাসম্ভব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বাংলা প্রায় পাঁচ কোটি লোকের কথ্যভাষা; এই হিসাবে ভারতবর্ষের মধ্যে ইহার স্থান প্রথম। আদম-সুমারির হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য হিন্দি দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া লিখিত হয়, এই জন্য হিন্দির স্থান বাংলার নীচে। পৃথিবীর মধ্যে কথ্যভাষা হিসাবে বাংলার স্থান সপ্তম। চৈনিক, ইংরেজি, রুশীয়, জার্ম্মানি, স্পেনীয় ও জাপানি ভাষার পরেই ইহার স্থান।

একমাত্র বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমা মধ্যেই যে বাংলা ভাষা কথিত হয় তাহা নহে; আসাম প্রদেশেরও সমগ্র সুরমা উপত্যকা (শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলা), ব্রহ্মদেশের আকিয়াব অঞ্চল ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চলে (গোয়ালপাড়া) বাংলা ভাষাই কথিত হয়। আসাম

* "The real and natural life of language is in its dialects."—Max Muller.

প্রদেশের শতকরা ৪৩ জন বঙ্গভাষাভাষী; বিহার প্রদেশেরও পূর্ব্ব সীমান্তের জিলাগুলিতেই প্রায় বঙ্গভাষাই কথ্যভাষা। এতদ্ব্যতীত বৈষয়িক ব্যাপরে লিপ্ত বহু বঙ্গভাষাভাষী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাস করিতেছে।

এই বিস্তৃত লোকসমাজের কথ্যভাষার প্রকৃতি এক নহে; বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সমাজে ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্ত্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

ভাষাতত্ত্বামোদীর নিকট ব্যাকরণানুগত সাধুভাষা (literary language) অপেক্ষা লৌকিক কথ্যভাষাই অধিকতর মূল্যবান্। এই জন্য পাশ্চাত্য দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ভাষাতত্ত্বানুরাগী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক তত্তদ্দেশীয় কথ্যভাষার ব্যাপক অনুশীলন হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে লণ্ডন নগরের English Dialect Societyর কার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমিতির উৎসাহী সদস্যেরা ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষার আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করতঃ ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। বঙ্গদেশেও এই বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের ব্যাপকতার তুলনায় উক্ত পরিষদের কৃতিত্ব এখনও অতি নগণ্যই বলিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার কথ্যভাষার উপযুক্ত আলোচনা এখন পর্য্যন্তও আরম্ভ হয় নাই। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ জি. এ. গ্রীয়ারসন্ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন (১) তাহা দূরীকরণের

---

(১) 'The subjects of the dialects of Bengali has never been sufficiently studied. In fact, Bengalis themselves, as a rule, know little about any dialect except that of their own home and that of Calcutta."—*Linguistic Survcy of India. Vol. V. Part I.*

আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা কথ্যভাষা সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহাও কয়েকজন বিদেশীয় ইংরেজ রাজকর্ম্মীই করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজিতে লিখিত বীম্ ও হল্‌হেড্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণে ও পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিত-প্রবর জি. এ. গ্রীয়ারসন্ সাহেব কর্ত্তৃক সংকলিত Linguistic Survey of India (Vol. V.)তেই বাংলার কথ্যভাষা লইয়া ব্যাকরণ-সম্মত উপায়ে কতক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এই বিদেশীয় পণ্ডিত-গণ এই কার্য্যে নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজেরাই কখনও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন নাই (২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গভাষার ইতিহাসেও কেবল সাধুভাষা ও কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষাই আলোচিত হইয়াছে; তাহাতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষার সম্পূর্ণ আলোচনা হয় নাই। এই বিষয় বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য।

বাংলা-ভাষিত এই বিস্তৃত ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের বাস। তাহাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক আচার ব্যবহার ও কৌলিক উদ্ভব (ethnic origin) যেমন এক নহে, তেমনি কথ্য ভাষার রীতিও বিভিন্ন। এই বিষয়ে পূর্ব্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির কথ্য ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

(২) ...."Englishmen whose foreign status naturally debars them from doing the work as thoroughly as it would be done by a native of the country, born with ears ready attuned to detect the slightest differences of pronunciation." —ঐ

সাধু ভাষা

কোন এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটি তাহার পিতাকে কহিল, পিতঃ! বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা আমাকে দি'ন।

কলিকাতা (আদর্শ কথ্য ভাষা)

কোনো য়্যাক্ লোকের দুটো ছেলে ছেল। তা'দের মোদ্দে ছোটটা তা'র বাপ্‌কে বোল্‌লো, বাবা, আমার ভাগের বিষয় আমাকে দাও।

মেদিনীপুর

এক লোক্কার দু'ট্টা পো থাইল। তান্নেকার মাঝু কোচ্যা পো নিজের বাফুকে বল্ল, বাফুহে! বিশে আশের যে বাঁটি মুই পা'ব সেটা মোকে দ্যা।

সাঁওতাল পরগণা

এক জঁড়ের দুইট' বেটা আছ্‌লেক্। উহিঁয়ার মধ্যে ছট' বেটা আপড়াঁর বোবাক্ বল্‌ল, ও বোবা, ধনের জাহার বাখ্‌রা মুই ভেঁটকে মোখে দে।

মালদহ

য়্যাক্ ঝোন্ মানসের দুটা ব্যাটা আছ্‌লো। তারঘোর বিচে ছোট্‌কা আপনার বাবাক্ কহ্‌লে, বাবধন, করির যে হিস্সা হামি পামু, সে হামাক দে।

রংপুর

একজন মানুষের দুইকনা ব্যাটা আছিল্। তার ছোট কোনো উয়ার বাপক কইলি, বা, মোর পাইসা কড়ির ভাগ মোক্ দেও।

দার্জ্জিলিং

অ্যাক্ ঝন্‌কার দুইটা ব্যাটা ছিল। তারহে বিচং ছোট বেটাটা আপনার বাপক্ কোহোল, হে বা, ধন দোলং যেই মুই পাম ত্যা মোক্ দে।

বগুড়া

এক মানুসের দুডা ছ'ল অ্যাছ্‌লো। তার মধ্যে যাই ছোট' তাই তার বাপেক্ কলো, বাবা, হামার সম্পত্তির যা ভাগ হয় তা মোক্ দিয়া দাও।

যশোহর

একজনের দু'ট ছল ছিল। তার গে মাদ্দি ছোট জোন তার বাপেরে বলে, বাবা! জমা জমির যে ভাগ আমি পা'ব আমারে দ্যাও।

ময়মনসিংহ

একজনের দুই পুৎ আছিল্। তার ছুডু পুতে বাপেরে কইলো, বাজি! মাল-ব্যাসাতের যে বখ্‌রা আমি পাইয়াম তা আমারে দেউখাইন্।

বরিশাল

একজন মানষের দুগ্‌গা পোলা আছিল্। তার গো ছুটুগ্‌গা হের বাপেরে কইল, বাবা বিত্তের যে ভাগ পামু তা' মোরে দেও।

চট্টগ্রাম

এওয়া মানুস্যের দুয়া পোয়া আছিল্। ছাডুয়া তার বাপরে কইল, বায়াজি আঁর হিচ্ছার সম্পত্তি আঁরে দেয়।

ভৌগোলিক সংস্থান

প্রাচীন বঙ্গের তিনটি প্রধান ভৌগোলিক বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক বঙ্গের কথ্য ভাষাকে মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, রাঢ় ভাষা, পুণ্ড্র অথবা বরেন্দ্র ভাষা ও বঙ্গভাষা।* ইহাতে যথাক্রমে স্থূলতঃ পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষা বুঝায়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে দক্ষিণ বঙ্গ অথবা নিম্ন বঙ্গ অপেক্ষাকৃত আধুনিক-কালে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইয়াছে, এবং বাংলার পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীরা আসিয়াই ইহাতে বসতি স্থাপন করিয়াছে; সেইজন্য দক্ষিণ বঙ্গের নিজস্ব কথ্য ভাষার কোন্ বৈশিষ্ট্য নাই;—ইহার পূর্ব্বভাগ পূর্ব্ব বঙ্গের, পশ্চিম ভাগ পশ্চিম বঙ্গের ও উত্তর ভাগ উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষা দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

এই তিনটি স্থূল বিভাগকে পুনরায় কতকগুলি উপবিভাগদ্বারা বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন,

রাঢ়ঃ পশ্চিম রাঢ়, দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় ও পূর্ব্ব রাঢ়। মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া; মেদিনীপুর; পূর্ব্ব বর্দ্ধমান, হুগ্‌লি, হাওড়া, চব্বিশপরগণা, কলিকাতা, পশ্চিম নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এই উপবিভাগগুলির অন্তর্গত।

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সহিত কামরূপকেও অন্য এক স্বতন্ত্র বিভাগ বলিতে চাহেন। ("The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. 1. Introduction. Pg. 138) কিন্তু গভীর ভাবে অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে, কামরূপের কথ্য ভাষা পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রের ভাষার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন; অতএব কামরূপকেও বরেন্দ্র ভাষার অন্তর্গত বলা যায়।

বরেন্দ্র : দক্ষিণ বরেন্দ্র, উত্তর বরেন্দ্র ও পূর্ব্ব বরেন্দ্র বা কামরূপ। মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া; জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া, দক্ষিণ দার্জ্জিলিং, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর; রংপুর, পশ্চিম গোয়াল পাড়া এই উপবিভাগগুলির অন্তর্গত।

বঙ্গ : পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ। ময়মনসিং, ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, সন্দ্বীপ, শ্রীহট্ট, কাছাড়; বরিশাল নোয়াখালি (সন্দ্বীপ ব্যতীত), চট্টগ্রাম; পূর্ব্ব নদীয়া, পাবনা, যশোহর, খুলনা এই উপবিভাগগুলির অন্তর্গত।

ভৌগোলিক সীমা দ্বারা কথ্য ভাষার স্থান নির্দ্দেশ কখনই নির্ভুল হইতে পারে না। কারণ, কথ্য ভাষার বিভিন্নতার মূলে ভৌগোলিক কারণ অপেক্ষা মৌলিক (ethnic) কারণই অধিকতর কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নোয়াখালি জিলা ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে যে কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহাকে বঙ্গের দক্ষিণবিভাগীয় ভাষা বলা হইয়াছে। কিন্তু নোয়াখালি জিলারই অন্তর্গত সন্দ্বীপ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ভাষা সুদূর ঢাকা-ত্রিপুরা অর্থাৎ পূর্ব্ববিভাগীয় কথ্য ভাষার প্রকৃতির সহিত অভিন্ন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে জনমানবহীন এই সদ্য-সমুদ্র-গর্ভজাত দ্বীপটি ঢাকা ও ত্রিপুরা হইতে আগত নাবিকদিগ-দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল এবং ইহার অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্তও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক কৌলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

এই কৌলিক কারণই কথ্য ভাষার বিভিন্নতার মূল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণও আছে, কিন্তু তাহা অপ্রধান মাত্র। এখন এই সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কথ্যভাষা

—:×:—

রাঢ়
বরেন্দ্র
বঙ্গ
পশ্চিম
দক্ষিণ-পশ্চিম
পূর্ব্ব
দক্ষিণ
উত্তর
পূর্ব্ব
পশ্চিম
দক্ষিণ
পূর্ব্ব
মানভূম
সাঁওতাল পরগণা
বীরভূম
বাঁকুড়া
পশ্চিম বর্দ্ধমান
মেদিনীপুর
পূর্ব্ব বর্দ্ধমান
হাওড়া
হুগলি
২৪ পরগণা
কলিকাতা
পশ্চিম নদীয়া
মুর্শিদাবাদ
মালদহ
দঃ দিনাজপুর
রাজসাহী
বগুড়া
পূর্ণিয়া
দঃ দার্জ্জিলিঙ,
জলপাইগুড়ি
কুচ্‌বিহার
পঃ রংপুর
উঃ দিনাজপুর
পূর্ব্ব রংপুর
পঃ গোয়ালপাড়া
পূর্ব্ব নদীয়া
পাবনা
যশোহর
খুলনা
বরিশাল
নোয়াখালি
(সন্দীপ ব্যতীত)
চট্টগ্রাম
মৈমনসিং
ত্রিপুরা
শ্রীহট্ট
কাছাড়
ঢাকা
ফরিদপুর
সন্দীপ
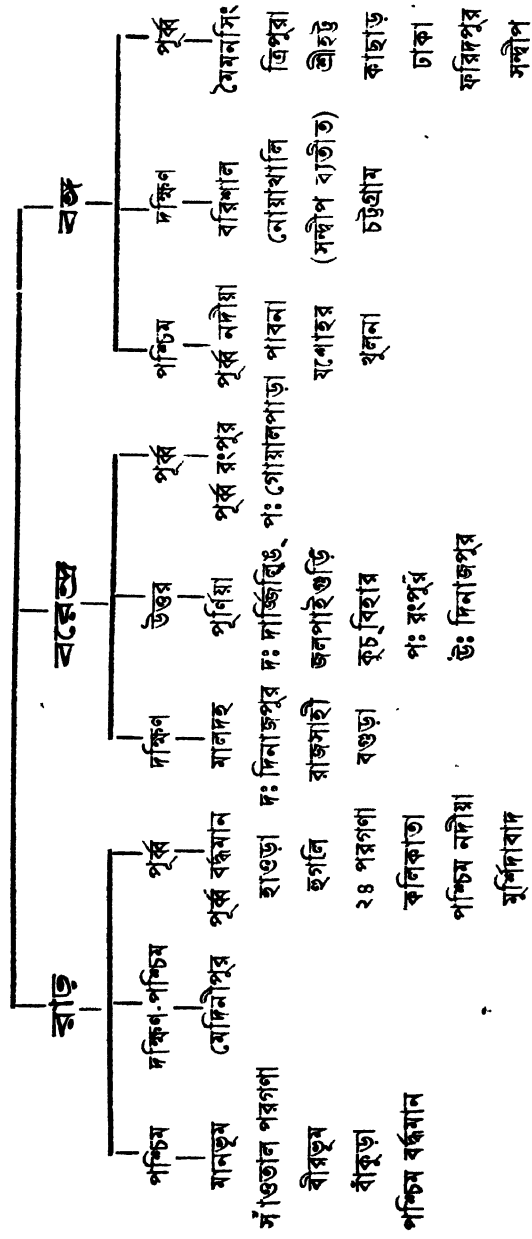
কথ্য ভাষার বিভিন্নতার কারণ

মৌলিক (Ethnic)

কথ্য ভাষার বিভিন্নতার মূলে যতগুলি কারণ বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যে মৌলিক কারণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সেইজন্য তাহা একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা যাইবে।

কোন এক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, "Nowhere are there presented stronger warnings against basing ethnological theroies on linguistic facts than in India." ভারতবর্ষের কোন জাতির ভাষা হইতে তাহার মৌলিক উদ্ভব নিরূপণ করিতে হইলে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ইহার কারণ, এই দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, এবং বিজিত ভারতীয়েরা নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিজেতার ভাষাই সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত মধ্যপ্রদেশের নাহাল জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নাহাল একটি ভারতীয় অনার্য্য জাতি; তাহাদের নিজস্ব কৌলিক ভাষা ছিল মুণ্ডা। দ্রাবিড় জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া তাহারা দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করিল, অতঃপর আর্য্য-জাতি যখন তাহাদের উপর অধিকার স্থাপন করিল তখন তাহারা দ্রাবিড় ভাষাও পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষাই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিল। অতএব বর্ত্তমানকালে মধ্যপ্রদেশের নাহাল জাতিকে আর্য্যভাষা বলিতে দেখিয়া তাহাদিগকে কেহ আর্য্যসন্তান বলিয়া ধারণা করিলে তাহাকে নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইতে হইবে।

বাংলা আর্য্যভাষার অন্তর্গত বলিয়া এই ভাষাভাষীদিগকে আর্য্য-

সন্তান বলিয়া স্থির করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যভাষা-ভাষীমাত্রই আর্য্যসন্তান হইবে, অন্ততঃ ভারতবর্ষে এই যুক্তি কার্য্যকরী হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদেরা বাংলার যে কুলপরিচয় দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

এই বিস্তৃত ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র মানব মূলতঃ এক-বংশ-সম্ভূত নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির মানব বিভিন্ন সময়ে জন্মলাভ করিয়াছিল। অতঃপর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ ব্যপদেশে এক জাতি অপর জাতির সম্মুখীন হইল তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। ইতিহাস পৃথিবীর এই সমস্ত বিভিন্ন আদিম জাতির বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আর্য্য, দ্রাবিড়, তিব্বত-চৈনিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই হয়ত কোন ভারতীয় নিজস্ব জাতি বাস করিত। অতঃপর তাহাদের সহিত বহির্ভারত হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

আদি মানবের এই বিভিন্নজাতীয় লোকের মধ্যে যেমন পরস্পর বাহ্য আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য ছিল, তেমনি তাহাদের আভ্যন্তরিক শারীর গঠনও অল্পাধিক পৃথক্ ছিল। এই আভ্যন্তরীণ শারীর গঠনের পার্থক্য হইতেই জীব-দেহের বাক্‌যন্ত্রপ্রণালীরও (vocal organic system) পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহা হইতেই মানুষের কথ্য ভাষার মৌলিক পার্থক্যের উদ্ভব। কালক্রমে দুই স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ আরম্ভ হইলে প্রত্যেকের কুলগত বা মৌলিক পার্থক্য অল্পাধিক মার্জ্জিত হইতে হইতে বংশপরম্পরায় অধস্তন পুরুষগুলিতেও সংক্রমিত হইয়া যাইতে থাকে এবং ইহা হইতেই পরবর্ত্তী কালে একই দেশের সমাজমধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ভারতের অন্যান্য জাতির

মানবের তুলনায় বাঙ্গালির মধ্যেই এই বৈষম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেইজন্য নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই জাতি বহু সংমিশ্রণের ফলে জাত।

পৃথিবীর আদি মানব-সমাজের মৌলিক বিভাগ অনুযায়ী তাহার ভাষাও বিভিন্ন হইয়াই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আদি মানবের পাঁচটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী জাতি এখানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, যথা আর্য্য, দ্রাবিড়, মুণ্ডা, মন্‌খেমর ও তিব্বত-চৈনিক। আধুনিক কথ্য ভাষার উচ্চারণে এই পাঁচটি আদি মানবজাতির ভাষার প্রভাব অল্পাধিক বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সেই সমস্ত ভাষাভাষী স্বতন্ত্র জাতিগুলির মধ্যে পরবর্ত্তী কালে কেহ বা আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বা এখন পর্য্যন্ত তাহাদের মৌলিক ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলার সীমান্তে পর্ব্বতে অরণ্যে কোনভাবে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। এই সম্পর্কে বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তে কথিত খাসিয়া ও জন্তিয়া পর্ব্বতের খাসি ভাষা (প্রাচীন মন্‌খেমর জাতিভুক্ত), উত্তর সীমান্তে কথিত ভুটান ও সিকিম অঞ্চলের ভুটিয়া প্রভৃতি ভাষা (তিব্বত-চৈনিক জাতিভুক্ত,) ও পশ্চিম সীমান্তে কথিত রাজমহল অঞ্চলের মাল্‌তো (দ্রাবিড় জাতিভুক্ত) ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতালদিগের ভাষা (মুণ্ডা জাতিভুক্ত)র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলার সমতল ভূমিতে অধুনা বাঙ্গালি বলিয়া কথিত যে জাতির বাস তাহা প্রধানতঃ দ্রাবিড় ও তিব্বত-চৈনিক (মোঙ্গলীয়) জাতির সংমিশ্রণে জাত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতির সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ

'বাঘা চং', 'বানিয়া চং' ও পশ্চিম বঙ্গের 'বজড়া', 'শিউড়ি', 'হাড়মাসাড়া' প্রভৃতি যথাক্রমে তিব্বত-চৈনিক ও দ্রবিড় উদ্ভবেরই পরিচয় দেয়।

ঐতিহাসিক যুগে যে সমস্ত আর্য্যেতর জাতি আর্য্যভাষার অন্তর্গত বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

খরিয়া ও পাহাড়ি ছোটনাগপুরের দুইটি অষ্ট্রো-এশিয়-শ্রেণীভুক্ত অনার্য্য জাতি। তাহাদের মৌলিক ভাষা ছিল মুণ্ডা জাতীয়। তাহারা বর্ত্তমানে মানভূম জিলায় বসতি স্থাপন করিয়া বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের বাংলা শব্দের উচ্চারণে মৌলিক মুণ্ডা প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহাদের কথিত বাংলা ভাষা খরিয়া থর ও পাহাড়ি থর নামে পরিচিত।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তে মালপাহাড়ি নামে এক দ্রবিড জাতি বাস করিত। তাহারা বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাদের আধুনিক বাংলা শব্দের উচ্চারণে দ্রবিড় প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর হইতে এক অনার্য্য জাতি উত্তর-বঙ্গ আক্রমণ করে। তাহারা কোচ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে উত্তর-বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইলে তাহারা আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করে। এই জাতির বংশধরেরা এখন প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও বিহারের পূর্ণিয়া জিলায় বসবাস করিতেছে। তাহাদের কথ্য বাংলাভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মীয় উচ্চারণ-রীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাইজং নামে এক তিব্বত-ব্রহ্মীয় জাতি বাস করিত। তাহারা বহুকাল যাবৎ তাহাদের মৌলিক তিব্বত-ব্রহ্মীয় হাইজং ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা হিন্দুধর্ম্মভুক্ত হইয়া বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের

কথ্য বাংলাভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মীয় উচ্চারণ-রীতি প্রবল। ইহার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"একজন্ মানলগ্ দুইদা থাকিবার। তানি আলাক্ হুটু পলারা বাপরাগে কয় যে বাবা! 'মর্ বক্রা আগক্ যে ময় পাব ও'দা মগে দি।"

উত্তর ময়মনসিংহের গারো, বানিয়া, হদি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর আরও কয়েকটি জাতি এই জাতীয় কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মধ্যভাগে বহু তিব্বত-ব্রহ্মীয় জাতির বাস। ইহাদের অনেকের কথ্যভাষা বাংলা কিন্তু লিখিবার অক্ষর ব্রহ্মদেশীয়। ইহাদের কথ্যভাষার উচ্চারণে তিব্বত-ব্রহ্মীয় প্রভাব এত অধিক যে, কেহ কেহ ইহাকে বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত করিতেই ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। এই ভাষার নাম চক্মা-ভাষা।

কাছাড় জিলার পূর্ব্বসীমান্তলগ্ন মণিপুর রাজ্যে ময়াং নামক এক তিব্বত-ব্রহ্মীয় জাতি বাস করিত। তাহাদের ভাষা বাংলা কিন্তু উচ্চারণ-রীতি তিব্বত-ব্রহ্মীয়। কিছুদিন হইল ময়াং জাতীয় লোক কাছাড় ও শ্রীহট্টের অনেক স্থলেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের মৌলিক উচ্চারণ-রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। এই ভাষার সামান্য একটু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

"মুনি আগোর পুতো দুগো আছিল্।" (কোন ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল।)

ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে এখনও তিব্বত-ব্রহ্মীয় ভাষা প্রচলিত কিন্তু দেশের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসীরা বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণেও মৌলিক প্রভাব বর্ত্তমান।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি অনুধাবন করিলে বাংলার কথ্যভাষার উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের কারণ কতকটা অনুমান করা যাইবে। এই উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই জাতির কৌলিক উদ্ভব নিরূপণ করা যায়, তাহার কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর জাতি দ্বারা তাহা নিরূপণ করা সম্ভব নহে।

ভৌগোলিক

দেশের ভৌগোলিক সংস্থানও জাতির কথ্যভাষাকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। দেশের মধ্যে দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও দুস্তর নদনদী থাকিলে তাহা হইতেই এক জাতীয় লোকের মধ্যেও কথ্য-ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাংলাদেশে পর্ব্বত ও অরণ্য তেমন না থাকিলেও বিশাল নদনদীসমূহের নিত্য ভাঙ্গাগড়ার জন্য ভৌগোলিক ঐক্যও কোনদিন গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সেইজন্য এই জাতি দীর্ঘকাল এক ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য হইতে চিরদিনই বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতেও তাহাদের মধ্যে কথ্যভাষাগত ঐক্য গঠনের সুযোগ হয় নাই। বঙ্গের তিনটি মূল ভৌগোলিক বিভাগ হইতেই কথ্যভাষারও মূল তিনটি বিভাগ, যথা, রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ, গড়িয়া উঠিয়াছে।

সামাজিক

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। স্থূল সাম্প্রদায়িক বিভাগগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগের অন্ত নাই। উচ্চতম শ্রেণীর হিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অস্পৃশ্য জাতি পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে শত শত খণ্ডিত সামাজিক অবস্থান রচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলীন, ভঙ্গ, শ্রোত্রিয় এবং কায়স্থের মধ্যে উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ ত নাইই, এমন কি নবশাখ-সম্প্রদায় ও জল-অনাচরণীয় জাতিদিগের মধ্যেও পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই। এই বিভিন্নমুখী সামাজিক জীবনের মধ্যে কথ্যভাষার সামগ্র ঐক্যও কোনদিনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রত্যেক খণ্ডিত-সামাজিক-পরিবেষ্টনীবদ্ধ ভাষা নিজস্ব ক্ষুদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মুখে মুখেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য একই দেশে বাস করিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা অল্পাধিক স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। যেমন, বর্দ্ধমান অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উগ্রক্ষত্রিয়ের (আগুরি) কথ্যভাষা স্বতন্ত্র এবং বাউরি ও বাগ্‌দির কথ্যভাষাও সর্ব্বাংশে এক নহে।

এতদ্ব্যতীত বাংলার প্রধান দুইটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আচারব্যবহার ও কৃষ্টিগত পার্থক্য এত অধিক যে তাহাদের মধ্যে, কেবল কথ্যভাষাগত কেন, এই পর্য্যন্ত বহির্জীবনেও কোন ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমান-দিগের ধর্ম্মভাষা আরবি ও পারসি বলিয়া তাহাদের কথ্যভাষার উচ্চারণ-রীতিও আরবি-পারসির উচ্চারণ রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। তাহাদেব

উচ্চারণ-রীতি সম্পূর্ণভাবে বাংলা, তবে আজকালকার ইংরেজি-শিক্ষিত পরিবারের কথ্যভাষায় যেমন ইংরেজি শব্দ মিশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের মধ্যেও সামান্য আরবি-পারসি কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র। একটি বিষয় এইখানে লক্ষ্য করিবার আছে যে, পারিবারিক জীবনে বাংলার মুসলমানেরাই কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দ আজিও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যেমন, 'বাজি' (বাপ্‌জি), 'মাইয়া' (মাতৃকা), 'নানা' (ননস্‌), 'চাচা' (তাত), 'ফুফা' (পিতৃস্বসা), 'পানি' (পানীয়), 'বুর্‌' (ডুব দেওয়া) প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃতজ তদ্ভব শব্দ একমাত্র মুসলমানসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত শব্দকে আরবি-পারসি শব্দ বিবেচনা করিয়া হিন্দুরা কদাচ ইহাদের ব্যবহার করে না। এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি যে ভাষাগত অনৈক্যের কতখানি কারণ হয় তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও কতক উপলব্ধি করা যাইবে।

কথ্যভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যখন দেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি শিক্ষিত ছিল না তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির কথ্যভাষা এক ছিল না। শিক্ষিতের কথ্য-ভাষা অশিক্ষিতের কথ্যভাষা হইতে স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে শিক্ষার সার্ব্বজনীন অধিকারের যুগে বর্ণগত পার্থক্য আর নাই ; এখন কথ্যভাষার যে প্রধান সামাজিক পার্থক্য তাহা শিক্ষিতের এবং অশিক্ষিতের।

শিক্ষিতের কথ্যভাষা কৃত্রিম। তাহা পুঁথির ভাষা ও কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য- ও নিজস্ব-কৌলিক-ভাষা ইত্যাদির সংমিশ্রণে জাত। অনবরত অভ্যাসের ফলে শিক্ষিতেরা নিজস্ব মৌলিক উচ্চারণের রীতি পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ কথ্যভাষার সাধু উচ্চারণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ। অতএব শিক্ষিতের ভাষা ও উচ্চারণ হইতে তাহার কুলপরিচয় পাইবার উপায় নাই। কিন্তু মৌলিক (ethnic) কারণে সকলেরই

আভ্যন্তরীণ বাক্‌যন্ত্রের শারীর গঠন এক নহে বলিয়া সকল শিক্ষিত সম্বন্ধেই এই যুক্তি কার্য্যকরী হয় না। এইজন্য অনেক শিক্ষিত পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী আজীবন কলিকাতায় বাস করিয়া বহু চেষ্টার ফলেও তাঁহাদের নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

অশিক্ষিতের ভাষা অকৃত্রিম; তাহার উচ্চারণ-প্রণালী জন্মলব্ধ, প্রকৃতির সহজ দান; ইহার মধ্যেই তাহার বহুপূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ও জড়াইয়া থাকে। এই অশিক্ষিতের কথ্যভাষাই ভাষাতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয়, শিক্ষিতের কথ্যভাষা নহে।

সামাজিক জীবনে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর রক্ষণশীলা। অশিক্ষিতা নারীর আচারে ব্যবহারে যেমন বহু প্রাচীন সংস্কার আত্মরক্ষা করিয়া থাকে তেমনি তাহার কথ্যভাষাও প্রাচীন জাতীয় ভাষার একটি দিকের সন্ধান দিয়া যায়। নারীর ভাষা নারীরই নিজস্ব সম্পদ; পুরুষকে তাহা গড়িয়া দিতে তাহাকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন হয় নাই, বাহিরের কোন বস্তুও তাহাতে রং ফলাইতে পারে না। নারী তাহার সহজাত অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই যেন এই সম্পদও লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য একই পরিবারের স্ত্রী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পর্য্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হয়। *

অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি লোকের জাত-ব্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতির কথ্যভাষা গড়িয়া উঠে। ইহাকে জাত-ব্যবসায়ের মত জাত-ভাষা বলা যাইতে পারে। মৌলিক উদ্ভব এক হইলেও যাহারা বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যের

* "বাংলায় নারীর ভাষা" নাম দিয়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "Women's Dialect of Bengal" নামে "Calcutta Review" পত্রিকায় এই বিষয়েই তাঁহার একটি ইংরেজি প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে।

উৎকর্ষ অপকর্ষ দ্বারা ক্রমে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে কথ্যভাষারও ঐক্য থাকিতে পারে না। এই ভাবে ছুতার, মৌরাইয়া, শুঁড়ি, লোয়াইত কুড়ি, লালবেগি, রিশি প্রভৃতি জাতি একই স্থানে বাস করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাংলাদেশে কয়েকটি যাযাবর-জাতিও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ স্থলের কথ্যভাষা তাহারা ব্যবহার করে না; ভ্রমণ-ব্যপদেশে যে সমস্ত অঞ্চলে তাহারা যাইয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক স্থলেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তাহারা পাইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বঙ্গের 'বাদিয়া' ও পশ্চিম-বঙ্গের 'পাথযারা' হা-ঘরেদিগের কথ্যভাষা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

রাজনৈতিক

রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য এই দেশকে যেভাবে কতকগুলি প্রাদেশিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহা হইতেও ভাষাগত কতক অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা, আসামি ও ওড়িয়া ভাষা অভিন্ন ছিল এবং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, যদি সমগ্র আসাম, পূর্ব্ব-উড়িষ্যা ও পূর্ব্ব-বিহার বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিত তাহা হইলে ওড়িয়া, মৈথিলি ও অসামি মূল বাংলাভাষারই অন্তর্গত তিনটি স্বতন্ত্র কথ্যভাষা মাত্র হইত। এই বিষয়ে প্রবীণ সাহিত্যিক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আক্ষেপোক্তি বিস্তৃতভাবেই উল্লেখযোগ্য।*

* * "সম্প্রতি একশত বৎসরও হয় নাই, আসামি-ভাষাকে বাংলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে বাংলাই আসামের রাজদরবারে ও বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত ছিল। কয়েকজন মিশনারি আসামের নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন ও তদুপযোগী অক্ষর তৈরি করিয়াছিলেন—তারপর যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, আসামের ভদ্রসাহিত্য অন্যরূপ—তাহা বাঙ্গালা, তাহাতে ওরূপ নিম্নশ্রেণীর ভাষা চলিবে না, তখন তাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষা তদ্দেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন—তাঁহাদের সামান্য ক্ষতিপূরণের ব্যপদেশে আসামের কথিত ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। প্রাদেশিক অভিমান সৃষ্টি করা সহজ, পৃথিবীতে যত জাতিবিরোধ এই ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে।"

বৃহৎ বঙ্গ,—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬

প্রকৃতপক্ষে বাংলারই একটি কথ্যভাষা এই প্রাদেশিক বিভাগের ফলে স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। ভাষাগত ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদেশ বিভাগ করিলে ভাষার অধিকার এইভাবে খর্ব্ব হয় না।

একই প্রদেশের অন্তর্গত পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি জিলার ভাষা পর্য্যন্ত একমাত্র এই রাজনৈতিক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র হইতে দেখা যায়। বাঁকুড়া, মানভূম ও পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের (আসানসোল মহকুমা) কথ্যভাষায় যদিও কোন মৌলিক প্রভেদ নাই, তথাপি এই বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের পরস্পরকে এই লইয়া অকারণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে শোনা যায়। পূর্ব্ব ময়মনসিংহবাসী শ্রীহট্টের ভাষাকে নিন্দা করে, শ্রীহট্টবাসী কাছাড়কে নিন্দা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লয় এবং এই নিন্দা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তজ্জাত সামাজিক ঐক্যের অভাব হইতেও কথ্যভাষার বিভিন্নতার সূত্রপাত হইয়া থাকে।

কথ্যভাষাসমূহের বিশেষত্ব

পশ্চিম রাঢ়

ব্যাকরণ

'আমি' 'তুমি'র প্রাচীন রূপ 'মুই' 'তুই'। পঞ্চমী বিভক্তির প্রত্যয় 'ঠেঞে'—'মোর ঠেঞে'। ষষ্ঠী বিভক্তির প্রত্যয় 'দের'—'মোদের'। সপ্তমী বিভক্তির প্রত্যয় 'কে'—'জল্‌কে'। উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎকালে 'ব'—'কর্‌ব'। মধ্যম পুরুষ অতীতকালে 'লে'—'তুই গিঁইছিলে'। প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎকালে 'বে'—'কর্‌বে'। নির্দ্ধারণী (Infinitive)র বিভক্তি 'তে'—'কর্‌তে'। উত্তম পুরুষ নিত্যবৃত্ত বর্ত্তমানের বিভক্তি 'ই' —'বল্লি' (বলিলাম)। ক্রিয়ায় স্বার্থে 'ক' বিভক্তি—'হবেক'। অসংবৃত ণিজন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার—'দেওয়া করালাম' (দিলাম)।

উচ্চারণ

বিবৃত স্বরের সংবৃত উচ্চারণ; 'তুমার' (তোমার)। 'ন' স্থানে 'ল' — 'লিচ্ছে' (নিতেছে)। 'র' 'ল' ও 'ন' স্থানে 'ড়'—'জঁড়ড়' (জনের)। ক্রিয়ার অন্ত্যস্বরের আনুনাসিকন—'খেঁঞে' (খাইয়া)। 'শ' 'ষ' 'স' স্থলে একমাত্র দন্ত্য 'স'র উচ্চারণ—'সব্দ' (শব্দ)।

ধ্বনি

শব্দের আদ্যস্বর ধ্বনিত হয় ও তজ্জনিত পরবর্ত্তী মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পীকৃত হয়। 'রৈঁচে' (রহিয়াছে)।

শব্দমধ্যস্থ স্বাধীন স্বর অধ্বনিত থাকে এবং তজ্জনিত তাহা লোপ পায়। 'যাবেক' (যাইবেক্)।

আদ্য স্বর ধ্বনিত হইয়া কোন কোন স্থলে 'হ' যুক্ত হইয়া থাকে। 'মোহর' (মোর)।

দক্ষিণ রাঢ়

দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা ওড়িয়া-ভাষা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থান ব্যতীত মৌলিক কারণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। মেদিনীপুর সদরের পশ্চিম ভাগ ও তমলুক মহকুমা উড়িষ্যা হইতে আগত ওড়িয়া-ভাষী কৈবর্ত্তজাতিদ্বারাই বিস্তৃতভাবে অধ্যুষিত হইয়াছিল। সেই ওড়িয়া-ভাষার উপরই তাহারা বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান ওড়িয়ার সহিতও তাহার সম্পর্ক অতি সন্নিকট। এই অঞ্চলের বাংলাভাষা কতক ওড়িয়া ও কতক পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চারণ ও ধ্বনির রীতি দ্বারাই নিয়মিত। তবে সামান্য ব্যতিক্রমও আছে।

ব্যাকরণ

ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন প্রত্যয় 'কার'—'তান্নেকার' (তাহাদের)। বাংলা 'অছ্' ধাতুর স্থলে ওড়িয়ার 'অথ্' ধাতু—'থাইল' (ছিল)।

উচ্চারণ

বিবৃত স্বর—'পো' (পুত্র, পুত), 'এক' (অ্যাক নহে)। অনুনাসিকের অপেক্ষাকৃত অভাব—'খেয়ে'। অধ্বনিত স্বরের লোপ, 'বিষে আশে' (বিষয় আশয়)।

ধ্বনি

শব্দের আন্তস্বরধ্বনিত (বঙ্গের সহিত তুলনীয়) ও তজ্জনিত তদাশ্রিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্বীকরণ—'তুট্টা' (তুটা) ও অনাদ্য অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহীকরণ, 'বাফু' (বাপু)।

পূর্ব্ব রাঢ়

উত্তর বঙ্গে গৌড়ীয় শাসকগণের আধিপত্য লুপ্ত হওয়ার পর নবদ্বীপ যে শুধু বাংলার রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিল তাহা নহে, প্রাচীনকালে গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া যেমন বাংলার আদর্শ কথ্যভাষা বা গৌড়ীয় সাধুভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনি তখন হইতেই নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান আদর্শ কথ্যভাষার জন্ম সূচিত হইল। ভাগীরথীর পবিত্রতায় আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায় অর্থাৎ শিক্ষিত-সমাজ এই নদীর দুই তীর জুড়িয়া এক শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ পীঠ গড়িয়া তুলিলেন। এইজন্যই কথিত হয়—

"ভাগীরথী উভকূল.
বারাণসী সমতুল।"

এইভাবে মধ্যযুগ হইতেই ভাগীরথী-তীরের বা পূর্ব্বরাঢ়ের ভাষা আদর্শ কথ্যভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী কলিকাতা বর্ত্তমান বাংলার রাজধানী ও ভারতের প্রধানা নগরীতে পরিণত হওয়ার জন্য ইহা সমগ্র বাংলার আদর্শ কথ্যভাষা হিসাবে সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যাকরণ

প্রথম পুরুষ সমাপিকা ক্রিয়ায় 'লে'—'সে দিলে' (দিল)। পঞ্চমী বিভক্তির প্রত্যয় 'থেকে'—'হাত থেকে'।

উচ্চারণ

স্বর-উচ্চারণ অত্যন্ত বিশ্লথ। শব্দমধ্যস্থ কোন ধ্বনিত স্বর দ্বারা অধ্বনিত স্বর সর্ব্বদাই প্রভাবিত হইয়া থাকে। (পূর্ব্ব অধ্যায়ে স্বর-সমন্বয় দ্রষ্টব্য)।

'এ'র সংবৃত উচ্চারণ 'অ্যা'—'গ্যালো' (গেল)। 'অ'র সংবৃত উচ্চারণ 'ও'—'মোন' (মন)। 'ল' কোন কোন সময় 'ন' উচ্চারিত হয়। 'নেবু' (লেবু), 'নক্ষী' (লক্ষ্মী), অনাদ্য 'ক' স্থলে 'গ'—'কাগ' (কাক)। স্বর-সংকোচন—'দি'ন' (দিউন)। অনুনাসিকের উচ্চারণ নিয়ম-সঙ্গত—'চাঁদ' (চন্দ্র)। 'ছ' কখনও কখনও 'স' উচ্চারিত হয়,—'গিস্‌ল' (গিয়াছিল)।

ধ্বনি

শব্দের আদ্য স্বর সর্ব্বদাই ধ্বনিত হয় ও তজ্জনিত অধ্বনিত স্বর ও কোন কোন সময় ব্যঞ্জন-ধ্বনি লোপ পায়। 'দু' (দুই), 'চ' (চল্)। এই জন্যই অনাদ্য মহাপ্রাণ বর্ণও অল্পপ্রাণে পরিণত হয়। 'মাচের মাতা' (মাছের মাথা)।

দক্ষিণ বরেন্দ্র

ব্যাকরণ

দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির প্রত্যয় 'ক্': 'বাবাক্' (বাবাকে)। বহুবচনে 'ঘরে'—'আমাঘরে'। ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে 'কেরে', 'ঘোর'; 'আমাকেরে' 'আমাঘোর'। সপ্তমী বিভক্তির প্রত্যয় 'এত্'; 'ক্ষেতেত্' (ক্ষেতে)। উত্তম পুরুষ এক বচনে 'আমি'র স্থলে 'হামি'। উত্তম পুরুষ

ভবিষ্যৎকাল-বাচক ক্রিয়ার প্রত্যয় 'আম্'—'যাম্ (যাইব)। নির্দ্ধারণীর বিভক্তি 'বা'—'কর্‌বা' (করিবার জন্য)।

উচ্চারণ

স্বরান্ত 'ইল'-প্রত্যয়ের স্থলে কোন কোন স্থলে হসন্ত 'ইল্' প্রত্যয়। 'জ'র উচ্চারণ সর্ব্বদাই মহীকৃত 'ঝ'—'ঝন্' (জন্)। শব্দমধ্যস্থ অধ্বনিত স্বরের লোপ ; 'কলো' (কইলো)।

ধ্বনি

শব্দের আদ্যস্বর ধ্বনিত হইলেও পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে ; যেমন, 'মধ্যে'। শব্দমধ্যস্থ অধ্বনিতস্বরোচ্চারণ লুপ্ত হয়। 'পা'ল' (পাইল)।

উত্তর বরেন্দ্র

ব্যাকরণ

দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির প্রত্যয় 'ক' ; 'মোক্'। পঞ্চমী বিভক্তির প্রত্যয় 'হো'তে'—'হাত হোতে'।

উচ্চারণ

স্বরান্ত 'ইল' প্রত্যয় সর্ব্বত্র 'ইল্' উচ্চারিত ; 'কইল্' (কহিল)। 'জ' সর্ব্বত্র 'ঝ'। 'এ' এবং 'অ'র বিবৃত উচ্চারণ, 'এক্' 'জন্'। 'র'র মধ্যে মধ্যে 'ল' উচ্চারণ—শরীল্' (শরীর)। স্বরোচ্চারণ অপেক্ষাকৃত বিশ্লথ—'উয়ার' (ইহার), 'মান্‌সির্' (মানুষের)। অনাদ্য 'হ'র লোপ—'অর' (ইহার)।

শব্দমধ্যে একই ব্যঞ্জন বর্ণ পুনরুচ্চারিত হইলে তন্মধ্যে একটির বিলোপ —'বা' (বাবা)।

ধ্বনি

শব্দের আগুস্বর সামান্য ধ্বনিত হয় ও সেইজন্য পরবর্ত্তী স্বর-ধ্বনি লুপ্ত হয়। 'মান্‌সির' (মানুষের)।

পূর্ব্ব বরেন্দ্র

ব্যাকরণ

উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎকালের প্রত্যয় 'ম'—'পাইম' (পাইব)।

উচ্চারণ

'অ'র সংবৃত উচ্চারণ 'ও'—'বোন্‌' (বন্‌); দন্ত্য 'স'র স্থলে প্রায়ই 'ছ্‌'র উচ্চারণ—'হিচ্ছা' (হিস্সা)। শব্দের আদিতে 'র' থাকিলে তাহা কখনও কখনও লোপ পায় এবং শব্দমধ্যস্থ 'অ' কি 'আ' স্বার্থে 'র' যুক্ত হয়—যেমন, 'আমবাবুর বাগানের রাম' (রামবাবুর বাগানের আম)।

ধ্বনি

শব্দের উপান্ত স্বর ধ্বনিত হয় কিন্তু শব্দমধ্যস্থ অধ্বনিত-বর্ণের উচ্চারণ-মর্য্যাদাও সম্পূর্ণই রক্ষিত হয়; 'আছিল্‌' (ছিল)।

পূর্ব্ববঙ্গ

ব্যাকরণ

দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রত্যয় একবচনে 'রে' ও বহুবচনে 'রারে' 'গোরে'

—'আমারে', 'আম্‌রারে', 'আমাগোরে' ইত্যাদি। পঞ্চমী বিভক্তির প্রত্যয়, 'থে', 'থাক্যা'—'কইথে' (কোথা হইতে)। ষষ্ঠী বিভক্তির প্রত্যয়, বহুবচনে 'গো', 'রার'—'আমাগো' 'আমরার্'। সপ্তমী বিভক্তির প্রত্যয় 'অ' 'ত্'—'দেশ', (দেশে), 'বাড়ীত্' (বাড়ীতে)। উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎ-কালে 'ইয়াম্'—'খাইয়াম্' (খাইব)। মধ্যম পুরুষ অতীতকালে 'লা'—'গেছ্‌লা' (গিয়াছিলে)। প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎকালে 'ব'—'কর্‌ব' (করিবে)। নির্দ্ধারণীর বিভক্তি 'অন্'—'করন্' (করা)।

উচ্চারণ

চন্দ্রবিন্দুর অভাব ও তৎস্থলে বর্গীয় অনুনাসিকের সংরক্ষণ—'চান্' (চাঁদ)। 'ড়'স্থলে সর্ব্বত্র 'র'—'পরা' ('পড়া') 'শ', 'ষ', 'স' স্থলে এক-মাত্র 'শ'—'শেবা' (সেবা)। আদ্য মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পীকরণ—'বালা' (ভাল)। কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ বর্ণ 'খ'র নর্ম্ম উচ্চারণ 'হ'—'লেহা' (লেখা)। আদ্য 'শ', 'ষ', 'স'র 'হ' উচ্চারণ—'হিয়াল' (শৃগাল), 'হার' (ষাঁড়), 'হাপ' (সাপ)। শব্দের আদ্য 'হ'র লোপ ও তৎস্থলে মাত্র স্বর-ধ্বনির রক্ষা—'আউমাউ' (হাউমাউ)। তালব্যবর্ণের দন্ত্য-তালব্য-মিশ্র উচ্চারণ—'ৎচ' (চ), 'ৎজ' (জ)। 'এ'র বিবৃত উচ্চারণ—দেখ্' এবং 'ও'র সংবৃত উচ্চারণ 'উ'—চুর্ (চোর)। স্বর-ভুক্তি—'থাউক্', 'থাইক' (থাক্) এই ভাষার একটি বিশেষত্ব।

ধ্বনি

শব্দের অন্ত্যস্বর ধ্বনিত হয় এবং তদাশ্রিত ব্যঞ্জনের এইজন্য প্রায়ই দ্বিত্ব হয়। অধ্বনিত-স্বর কি ব্যঞ্জন সর্ব্বদাই লুপ্ত হয়—'বেক্কুব' (বেয়াকুব), 'এট্টু' (একটু), 'আজ্জের' (আধ সের)। আদ্য 'হ' লুপ্ত হইলে তাহার অবশিষ্ট স্বরোচ্চারণ ধ্বনিত হয়—'আত' (হাত)।

দক্ষিণ বঙ্গ

ব্যাকরণ

দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রত্যয় বহুবচনে 'গো', 'গরে'—'আমাগো', 'আমাগরে' (আমাদিগকে)। পঞ্চমী বিভক্তির প্রত্যয় 'থনে' 'থুনে'—'কইথনে' (কোথা হইতে ?)। ষষ্ঠী বিভক্তির প্রত্যয় বহুবচনে 'গো', 'গর'—'তাগো', 'তাগর' (তাহাদের)। উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎকালে 'মু' 'উম্'—'করমু', করুম্' (করিব)। অসংবৃত সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার—'যাইবার লাগ্ছি' (যাইতেছি)। নির্দ্ধারণীর প্রত্যয় 'তি', 'বার্'—'জান্তি', 'জান্বার' (জানিতে)। 'টা' 'টি'র স্থলে 'গা' প্রত্যয়, 'দুগ্গা' (দুটা)।

উচ্চারণ

অনাদ্য 'অ'র সংবৃত উচ্চারণ—'আছো' (আছ)। 'ক' 'প' প্রভৃতি অল্পপ্রাণ বর্ণের 'মহীকরণ'—'খোন্' (কোন্), 'ফরামর্শ' (পরামর্শ)। অনাদ্য কণ্ঠ্যবর্ণের নর্ম্ম উচ্চারণ—'সুগ' (সুগ)। অনাদ্য 'ট'র নর্ম্ম উচ্চারণ 'ড'—'ছুডু' (ছোট)। অন্যান্য মূর্দ্ধন্য বর্ণেরও প্রায় 'ড' উচ্চারণ—উড়্' (উঠ্)।

ধ্বনি

শব্দের আদ্যস্বর ধ্বনিত হয় কিন্তু তথাপি পরবর্ত্তী স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-মর্য্যাদা প্রায় সমান থাকে, মাত্র দুই এক স্থলে অধ্বনিত স্বর ও ব্যঞ্জন লুপ্ত হয় মাত্র—'আঁর' (আমার), 'বাউ' (বাপু)।

পশ্চিম বঙ্গ

ব্যাকরণ

(বঙ্গের অন্যান্য অংশের কথ্যভাষার সহিত কোন পার্থক্য নাই)

উচ্চারণ

অতীতকালে স্বরান্ত 'ইল'-প্রত্যয় (বঙ্গের অন্যত্র হসন্ত) । স্বর-সংকোচন—'ছল' (ছাওয়াল), 'কল' (কইল)। বিবৃত 'ও' এবং সংবৃত 'অ'—'ছোটো' (ছোট)। সংবৃত 'এ'—'দ্যাও' (দেও)।

ধ্বনি

শব্দের আদ্যস্বর ধ্বনিত হয় এবং তজ্জনিত 'অ' স্বরের কথনও কথনও সংবৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন, 'জোন্' (জন) ; কিন্তু শব্দমধ্যস্থ অন্যান্য স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে,—'দুই'।

উপসংহার

বর্ত্তমান আকৃতির সামান্য একখানি পুস্তকে শুধু কয়েকটি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াই বানানসম্বন্ধে কোন নিয়ম স্থাপন করা সম্ভব নয়। ইহা বিশ্বস্ত কোন অভিধানেরই কার্য্য। বাংলার কোন ভবিষ্যৎ আভিধানিক যদি শব্দের বানান-গঠনের পূর্ব্বে এই পুস্তিকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া ল'ন তাহা হইলেই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

প্রমাণ-পঞ্জী

Linguistic Survey of India (G. A. Grierson) Vol. I and V.

Imperial Gazetteer of India. Vol. I.

District Gazetteers of Bengal.

Bengali Grammar (Beams).

Sanskrit Grammar (W. D. Whitney)

Bengal Behar and Orissa Sikkim (L. S. S. O' Malley).

The Origin and Development of the Bengali Language (S. K. Chatterji).

A Brief History of the Bengali Language (Md. Sahidullah)—Dacca University Journal, 1932.

বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

বৃহৎ বঙ্গ (দীনেশচন্দ্র সেন)

রূপাশাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাংলা উচ্চারণ-তত্ত্ব (সুশীলকুমার দে) —সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

শব্দকথা (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

ব্যাকরণ-বিভীষিকা (ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

বানান-সমস্যা ঐ